ALWAYS EXCLUSIVE
Vandana
SAREES
Cotton Printed Sarees
Contact - 22188744/1386

স্বস্তিকা

দাম ঃ ৪.০০ টাকা

৬২ বর্ষ ৪ সংখ্যা ।। ২১ ভাদ্র, ১৪১৬ সোমবার (যুগাব্দ - ৫১১১) ৭ সেপ্টেম্বর, ২০০৯ ।। Website : www.eswastika.com

আসবাব
বর্ধমান
(০৩৪২) ২৫৬৫৯৩১

স্কুল কমিটি ও সমবায় নির্বাচনে গো-হারা সি পি এম

নিজস্ব প্রতিনিধি ।। রাজ্যে সওয়া তিন দশকের শাসনকালে এমন গাড্ডায় কখনও পড়েনি সিপিএম নেতৃত্ব। একের পর এক স্কুল পরিচালন সমিতিগুলো হাতছাড়া হয়ে পড়ছে তাদের। এমনকী যে এলাকাগুলো এখনও সিপিএমের শক্ত ঘাঁটি সেই অঞ্চলের স্কুলগুলির পরিচালন সমিতির নির্বাচনেও পরের পর পরাজয়ের সম্মুখীন হচ্ছে সিপিএম। সেই সাথে কো-অপরেটিভগুলির নির্বাচনেও একের পর এক লালদুর্গ তাসের ঘরের মতো ভেঙ্গে পড়ছে।

সি পি এম বহু জায়গায় এখন প্রার্থী দিতে চাইছে না। কিছু জায়গায় তো প্রার্থীই দিতে পারছে না। অবস্থা এতই শোচনীয়।

এই দুর্মূল্যের ভোট বাজারেও গত বছর পুরুলিয়ার পাড়া বিধানসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচনে নিজেদের ভোট-ব্যাঙ্ক সিপিএম তো অটুট রেখেছিলই, উপরন্তু সেই ভোট-ব্যাঙ্ক আরও কিছুটা সমৃদ্ধ করতেও সমর্থ হয়েছিল। এহেন পাড়া বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত দু'টি স্কুলের পরিচালন সমিতি নির্বাচনেও পরাস্ত হয়েছে সিপিএম। একইসাথে বাঁকুড়া এবং বিষ্ণুপুরের দু'টি স্কুলেও গোহারান হেরেছে সিপিএমের প্যানেল। নদীয়ার চাকদহের দু'টি এবং ধানতলার দু'টি স্কুলের পরিচালন সমিতির নির্বাচনে হেরে যায় মার্কসবাদীরা। মুর্শিদাবাদ জেলার হরিশ্চন্দ্রপুরের একটি বিদ্যালয়ের পরিচালন সমিতির নির্বাচনে সিপিএমকে হারিয়ে তা পুনর্দখল করে নেয় বিরোধীরা।

এরই পাশাপাশি সমবায় সমিতিগুলির নির্বাচনেও গো-হারান হারছে সিপিএম। নদীয়ার ফুলিয়া কো-অপরেটিভ সোসাইটির আগেই দখল নিয়েছিল বিরোধীরা। ইদানীং হাতছাড়া হলো খোদ মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের নিজের বিধানসভা কেন্দ্র যাদবপুরের অন্তর্গত মুকুন্দপুর কলোনী। সেখানকার ২৬টি আসনের মধ্যে ১৭টি আসনেই জয়লাভ করে বিরোধীরা। গত ৩৩ বছরে এই ধরনের ফলাফল রাজ্যের ইতিহাসে অভূতপূর্ব।

দক্ষিণবঙ্গে স্কুল পরিচালন সমিতিতে সিপিএমের হারের রেশ পড়েছে অপেক্ষাকৃত বেশী শক্তিশালী রাজনৈতিক ঘাঁটি উত্তরবঙ্গে। সেখানকার কোচবিহার জেলার একটি স্কুলের পরিচালন সমিতি চলে গিয়েছে বিরোধীদের হাতে।

তবে এক্ষেত্রে সিপিএমের সবচেয়ে খারাপ অবস্থা হুগলি এবং তাদের শক্ত রাজনৈতিক ঘাঁটি বর্ধমানে। কাটোয়া থেকে কালনার মধ্যে বর্ধমানের দশটি স্কুলের পরিচালন সমিতির নির্বাচনে পরাজয় ঘটেছে সিপিএমের। এর মধ্যে কাটোয়াতে বিরোধীরা দু'টি স্কুলে প্রতিদ্বন্দ্বীহীন অবস্থায় জয়ী হয়। সম্প্রতি কাটোয়াতে রাজ্য সরকারের তরফ থেকে প্রস্তাবিত ১০০০ মেগাওয়াট পাওয়ার প্লান্ট বসানোর কাজ শেষ হয়েছে। কিন্তু 'অ্যান্টি ইনকাম্বেন্সি'-র

(এরপর ৪ পাতায়)

বৈদিক ভিলেজ কাণ্ড

জমি-মাফিয়া দল সরকার একাকার

গূঢ়পুরুষ ।। বৈদিক ভিলেজ বিতর্ক নিয়ে রাজ্য রাজনীতিতে যথেষ্ট জলঘোলা হচ্ছে। সি পি এম দলের মধ্যেই বিতর্ককে কেন্দ্র করে গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব প্রকাশ্যে চলে এসেছে। স্পষ্ট করে না বললেও পরোক্ষভাবে সকলেই মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের পুলিশ ও প্রশাসন পরিচালনায় সার্বিক ব্যর্থতার দিকেই অভিযোগের আঙুল তুলেছেন। প্রশ্ন উঠেছে একটা পাঁচতারা রিসর্ট করার জন্য দেড়

রেজ্জাক মোল্লা

রাজকিশোর মোদী

গৌতম দেব

হাজার একরের মতো জমির দরকার হলো কেন? মস্তানদের দিয়ে গরিব মানুষের জমি কেড়ে নেওয়া হলো অথচ কেউ জানতে পারল না। ভূমি রাজস্ব মন্ত্রী রেজ্জাক মোল্লা বলেছেন, তাঁর দফতর মাত্র ৪৪ একর জমি রিসর্ট গড়তে লিজ দিয়েছিল। তাই দেড় হাজার একর কৃষিজমি রিসর্ট কর্তৃপক্ষ কীভাবে যোগাড় করেছে তা তাঁর জানা নেই। রাজারহাট টাউনশিপের রূপকার আবাসন মন্ত্রী গৌতম দেব বলেছেন, ''রাজ্য সরকার এবং তাঁর দল সিপিএম-কে এই সব প্রশ্নের জবাব দিতে হবে''। দুঃখের কথা এতদিনেও দল বা সরকার প্রশ্নের জবাব দিতে পারেনি।

আসলে জবাব দেওয়া সম্ভব নয়। কারণ, জবাব দিতে গেলে মুখ্যমন্ত্রীকেই কাঠগড়ায় দাঁড় করাতে হয়। স্বীকার করতে হয়, মুখ্যমন্ত্রীর ব্যর্থতার জন্যই রাজ্য জুড়ে মস্তান-রাজ শুরু হয়েছে। স্বীকার করতে হয়, দলের চুনোপুঁটি নেতারাও জমি মাফিয়া বনে গেছেন সে কথাটা বিমান বসুর জানা নেই। স্বীকার করতে হয়, দলের মধ্যে অসামাজিক কাজকর্মে লিপ্ত কর্মীদের নিয়ন্ত্রণে বিমানবাবুরা ব্যর্থ হয়েছেন। এতসব ব্যর্থতার দায় মাথায় নিয়ে বিধানসভার নির্বাচনে সাফল্য পাওয়া অসম্ভব। তাই সব কিছুই আড়াল করতে হচ্ছে। আলিমুদ্দিনের নেতারা জানেন যে বুদ্ধদেববাবুকে সামনে রেখে বিধানসভার নির্বাচনে জয়লাভ আকাশ-কুসুম রচনা ছাড়া আর কিছু নয়। অথচ বুদ্ধদেববাবুকে সরিয়ে দিয়ে অন্য কোনও একজনকে মুখ্যমন্ত্রীর চেয়ারে বসানোও সম্ভব নয়। এই মুহূর্তে দলের একজনও নেতা নেই যাঁর ভাবমূর্তি উজ্জ্বল। গৌতম দেব, রেজ্জাক মোল্লার নাম উঠেছিল দলের বৈঠকে। তাঁরা স্পষ্টই বলে দিয়েছেন বর্তমান পরিস্থিতিতে মুখ্যমন্ত্রীর পদে বসতে আগ্রহী নন। নিজেরা কাঁটার মুকুট পরে বুদ্ধদেবকে বাঁচানোর আগ্রহ বা ইচ্ছা তাঁদের নেই। রেজ্জাক মোল্লা বলেছেন তাঁকে মুখ্যমন্ত্রী বা উপমুখ্যমন্ত্রী করলে বাঙালি মুসলমানদের ভোট পাওয়া যাবে বলে দলের নেতারা ভাবছেন। তা মোটেই বাস্তব নয়। নন্দীগ্রাম থেকে রাজারহাট সর্বত্রই গরিব বাঙালি মুসলমানরাই সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বলে মোল্লা সাহেব অভিযোগ করেছেন।

মোদ্দা কথাটা হচ্ছে রাজ্যের কোনও নির্বাচনেই সি পি এম বা বামফ্রন্ট আর জিতবে না। তা সে কলকাতা পুরসভার নির্বাচনই হোক অথবা বিধানসভার নির্বাচন। রাজনৈতিক পালাবদল হবেই। ডুবন্ত জাহাজে কে আশ্রয় নিতে চায়? তাই বামফ্রন্টের মুষলপর্বে শুরু হয়েছে পারস্পরিক দোষারোপের পালা। সম্প্রতি বর্ধমানে সি পি আইয়ের দলীয় সভায় এ বি বর্ধন সিপিএমের শিল্প নীতি নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। বলেছেন, সিঙ্গুর থেকে টাটারা চলে যাওয়ার পর রাজ্য সরকার অধিগ্রহণ করা জমি ফেলে রেখে দিয়েছেন কেন? টাটারা ছাড়া ভারতে দ্বিতীয় কোনও শিল্পপতি নেই সেখানে কারখানা গড়তে পারে! রাজ্য সরকার সিঙ্গুরের খাস জমিতে

(এরপর ৪ পাতায়)

অসমে ছাত্রের ছদ্মবেশে বাংলাদেশী মৌলবাদী

মাদ্রাসায় পাঠরত ছাত্ররা। (ফাইল চিত্র)

সংবাদদাতা ।। ''ছাত্র'-র ছদ্মবেশে মাদ্রাসায় বাংলাদেশী ও ইসলামি মৌলবাদীরা আশ্রয় নিচ্ছে বলে অভিযোগ করলেন উত্তর-পূর্বাঞ্চলের বিশ্ব হিন্দু পরিষদের সভাপতি জ্যোতিষ চন্দ্র পাঠক। প্রসঙ্গত, নাম না করে একইরকম অভিযোগ কেন্দ্রের কাছে মুখ্যমন্ত্রী সম্মেলনে জানিয়ে এসেছেন রাজ্যের কংগ্রেসী মুখ্যমন্ত্রী তরুণ গগৈ। গত ২৪ আগস্ট গুয়াহাটিতে এক সাংবাদিক সম্মেলনে রাজ্য সরকার এবং পুলিশকে জোড়হাট জেলার তিতাবর মহকুমার মেলামাটি মাদ্রাসার বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে অভিযোগ জানিয়েছেন বিশ্ব হিন্দু পরিষদের উত্তর পূর্বাঞ্চলের সভাপতি। তাঁর স্পষ্ট বক্তব্য ছিল, মেলামাটিতে ভারত বিরোধী বিদেশী এবং ইসলামি মৌলবাদীরা বহাল তবিয়তে রয়েছে। ওই মাদ্রাসার নাম 'মাদ্রাসা এ ইসলামিয়া'। ঘটনাচক্রে জোড়হাট আবার রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী তরুণ গগৈ-এর নিজের জেলা। রাজ্য পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, মাদ্রাসার ২৭ জন ছাত্র সন্দেহভাজন বাংলাদেশী। এখনও পর্যন্ত অসম পুলিশের সীমান্ত শাখার কাছে তারা তাদের ভারতীয় হওয়ার স্বপক্ষে কোনও প্রমাণপত্র জমা দিতে পারেনি। পুলিশ সূত্রে আরও জানা গিয়েছে যে, মাদ্রাসাটির ৯২ জন ছাত্রের মধ্যে ৬৫ জন কোনওমতে ভারতীয় নাগরিকত্বের প্রমাণ দিতে পেরেছে। তাদের মধ্যে একজন ছাত্র গোলাঘাট জেলার সরুপাথর-এর বাসিন্দা উল্লেখ করে জাল প্রমাণপত্র জমা দিয়েছিল। পুলিশের পক্ষ থেকে গোলাঘাট জেলার ফরেনার্স ট্রাইব্যুনালে মামলা দায়ের করা হয়েছে।

এদিকে জোড়হাট জেলার এস পি দীপক চৌধুরী জানিয়েছেন, ছাত্রদের এমাসের (আগস্ট) প্রথম সপ্তাহের মধ্যে নাগরিকত্বের প্রমাণপত্র দাখিল করতে বলা হয়েছিল। পদ্ধতিগত কাজকর্ম এগিয়ে চলছে, খুব তাড়াতাড়ি সব খবর জানা যাবে।

শ্রী পাঠক সাংবাদিকদের আরও বলেছেন, ''আমরা বার বার সরকারকে বলে

(এরপর ৪ পাতায়)

কেরলে ৯৪০ হিন্দু মেয়ে নিখোঁজ, ৪ হাজার ধর্মান্তরিত

নিজস্ব প্রতিনিধি ।। কেরলে পরিকল্পিত ও সংগঠিতভাবে হিন্দু মেয়েদের মুসলমান করা হচ্ছে। এই বক্তব্য কেরল রাজ্য পুলিশের। পুলিশের বক্তব্য, এর পিছনে রয়েছে মুসলিম সংস্থা 'পীপুলস্ ফ্রন্ট অফ্ ইন্ডিয়া'র ছাত্র শাখা। এই মুহূর্তে এ নিয়ে কেরল হাইকোর্টের নির্দেশে তদন্ত চলছে। এই চক্রান্তের খবরে বেরিয়ে এসেছে যে, দুজন এম বি এ ছাত্রীকে ওই ছাত্র শাখার দুই ক্যাডার — শাহেনশাহ এবং সিরাজুদ্দিন কোঝিকোড়ে নিয়ে গিয়ে গায়ের জোরে ইসলামে ধর্মান্তরিত করে। এবং তাদেরকে ভয় দেখিয়ে বিবাহ চুক্তিতে সই করায়। ওই মেয়ে দু'টি পথনামথিট্টা কলেজে এম বি এ পড়ত। হঠাৎই একদিন তাঁরা নিখোঁজ হয়ে যায়। হাইকোর্টে 'হেবিয়াস কর্পাস' পিটিশন করার ফলে তাদেরকে পুলিশ হাইকোর্টে পেশ

(এরপর ৪ পাতায়)

আয়ের সুবর্ণ সুযোগ!!!
SBI Life Insurance প্রমোট করছে ভারতবর্ষের সবচেয়ে বড় ব্যাঙ্ক State Bank of India, SBI Life সীমিত সংখ্যক Insurance Advisor নিয়োগ করছে।
যে কোনও পুরুষ / মহিলা HS পাশ / পিয়ারলেস, GTFS, Alchemist, Rose Valley ও সাহারা Agent / VRS নেওয়া Govt. Employee / Postal Agent / অবসরপ্রাপ্ত Bank Employee-রা আবেদন করতে পারেন।
যারা সফল কেরিয়ার করতে ইচ্ছুক তারা Interview-র জন্য যোগাযোগ করুন –
Mr. Ajoy Kumar Saha Mobile : 9830952221
SBI Life
INSURANCE
With Us, Your's Sure

বিজেপির ব্যাপারে সঙ্ঘ হস্তক্ষেপ করবে না ঃ ভাগবত

নিজস্ব প্রতিনিধি ।। বিজেপি বিরোধী তাবৎ শক্তির আশায় জল ঢেলে দিলেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সরসঙ্ঘচালক মোহনরাও ভাগবত। তিনি দ্ব্যর্থহীন ভাষায় জানিয়ে দিলেন, ভারতীয় জনতা পার্টি সব দ্বিধা-দ্বন্দ্বের অবসান ঘটিয়ে স্বমহিমায় শীঘ্রই উঠে দাঁড়াবে।

স্থান — দিল্লীর সঙ্ঘ কার্যালয়, বহুল পরিচিত ঝাণ্ডেলওয়ালার কেশবকুঞ্জ। উপস্থিত দেশ-বিদেশের সংবাদমাধ্যমের প্রায় আড়াইশ' প্রতিনিধি। রয়েছে ব্যাপক সংখ্যায় বৈদ্যুতিন সংবাদ মাধ্যমের ও বি ভ্যান। সকলেই আর এস এস প্রধানের পূর্ব -নির্দিষ্ট সাংবাদিক সম্মেলন সরাসরি সম্প্রচার করতে অত্যন্ত ব্যগ্র। আবার প্রিন্ট মিডিয়ার প্রতিনিধিরা ব্যস্ত হেডলাইন সংগ্রহ করতে। গত শুক্রবার (২৮ আগস্ট) বিকেলে এটাই ছিল দিল্লী সঙ্ঘ কার্যালয় চত্বরের দৃশ্য। বিজেপি-র অভ্যন্তরীণ সঙ্কট মোকাবিলায় আর এস এস-এর ভূমিকা নিয়ে সরসঙ্ঘচালক মোহনরাও ভাগবত সোজা স্পষ্ট ভাষায় উত্তর দিয়েছেন। তিনি বলেছেন — 'সঙ্ঘ কোনওরকম হস্তক্ষেপ করে না এবং করবে না। বিজেপি চাইলে আমরা পরামর্শ দিতে পারি মাত্র।' এ বিষয়ে শ্রী ভাগবত বিজেপি নেতা অরুণ শৌরীর কথা নাকচ করে দেন। এবং বলেন, একজন বিজেপি কর্মী চোখে জল নিয়ে তার কাছে এসে বলেছিল, কিছু করুন। এই ঘটনার উল্লেখ করে মোহনজী বলেছেন, দলের জন্য ব্যথা পায় এমন কর্মী যাদের আছে, সেই দল কখনও শেষ হয়ে যায় না। সারা দেশে বিজেপি-র লক্ষ লক্ষ কর্মী আছেন। তাঁরা সকলেই পার্টির জন্য কাজ করে চলেছেন। এজন্যই বিজেপি'র পতন হবে না। সব ঠিক হয়ে যাবে। বিজেপি'র জাতীয় সভাপতিকে তিনি বলেছেন, সবাই একত্রে পরামর্শ করে একমত হয়ে চলুন। দলের পরবর্তী সভাপতি

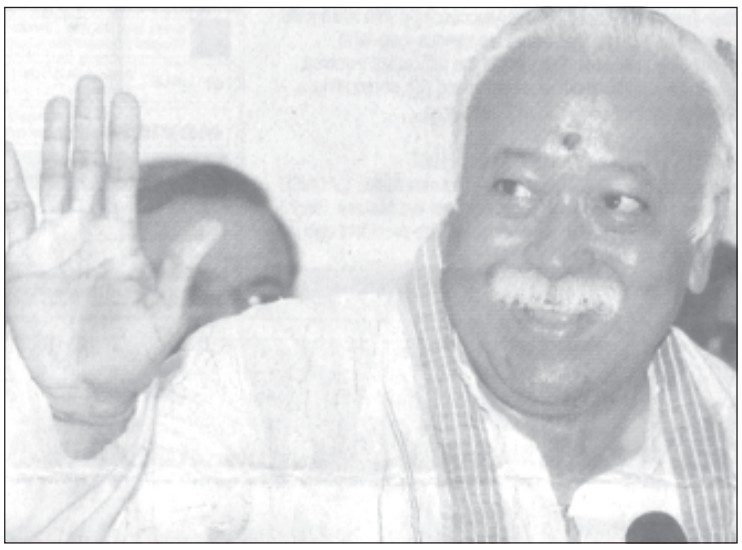

কে হবেন — তা বিজেপিই ঠিক করবে।

প্রসঙ্গত, এর আগেই মোহনজী এক বৈদ্যুতিন নিউজ চ্যানেলকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন, আর এস এস-এর স্বয়ংসেবকরা বিজেপি-তে আছেন। সেই জন্য তাঁরা সঙ্ঘের নেতৃত্বের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ ও কথাবার্তা বলেন। প্রয়োজনে পরামর্শ চান। তবে পৃথক সংগঠন ও রাজনৈতিক দল হিসেবে পরামর্শ বা দলের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেওয়া বিজেপি-র নিজস্ব অধিকার। সঙ্ঘ কখনও হস্তক্ষেপ করে না, উপযাচক হয়ে পরামর্শও দেয় না। সাংবাদিকরা বার বার একই প্রশ্ন করলে শ্রীভাগবতবলেন, ১৮ আগস্ট-এর কথাবার্তা ওয়েবসাইটে রয়েছে। যে কেউ দেখে নিতে পারেন।

মোহনজী যাবতীয় বিতর্কিত বিষয়ে কুশলতার সঙ্গে উত্তর দেন। যে সকল সাংবাদিক বিতর্কিত কথাবার্তার সন্ধানে ছিলেন তাঁরা স্বাভাবিকভাবেই আশাহত হন। এতসব সত্ত্বেও একটা কথা পরিস্কার যে, আর এস এস নেতৃত্ব বিজেপি'র অন্তর্দ্বন্দ্ব পছন্দ করছেন না। আকারে ইঙ্গিতে কিছু পরামর্শ অবশ্যই দিয়েছেন। যথাসময়ে তার প্রতিফলন দেখতে পাওয়া যাবে বলে ওয়াকিবহাল মহলের ধারণা।

এই সময়

বিশ্ব প্রসারী

সংস্কৃতের পঠন-পাঠনকে আরও বিশ্ব প্রসারী করতে উদ্যোগ নিল রাষ্ট্রীয় সংস্কৃত সংস্থান-এর লখনউ ক্যাম্পাস। ইতিমধ্যেই সংস্কৃতের শিক্ষকেরা এই বিষয়ে চিন্তা-ভাবনা শুরু করেছেন। ইন্টারনেটের মাধ্যমে খুব শীঘ্র বিভিন্ন অনুশীলনের ব্যবস্থা করছেন তাঁরা। যাতে ছাত্র-ছাত্রীরা ঘরে বসেও সংস্কৃতের কঠিন বিষয়গুলি সহজে আয়ত্ত করতে পারে। দু'মাসের মধ্যে প্রস্তাব কার্যকরী করা হবে বলে কর্তৃপক্ষ জানিয়েছেন। সংস্কৃতের শুদ্ধ বাক্য গঠনের পাশাপাশি ঝরঝরে সংস্কৃতে কথা বলতে ইন্টারনেটের ওয়েবসাইট বিশেষ কাজে লাগবে। বিশ্বের যে কোনও প্রান্ত থেকে তা ব্যবহার করা যাবে।

সিঁদুরে মেঘ

ভারতের পরম গর্বের বস্তু চান্দ্রায়ণ-১-এর সঙ্গে ২৯ আগস্ট অকস্মাৎ যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। ভারতীয় স্পেস রিসার্চ অর্গানাইজেশন (ইসরো)-এর ব্যাঙ্গালোর থেকে চল্লিশ কিলোমিটার দূরে বাইয়ালালু-তে অবস্থিত ইসরোর গ্রাউন্ড স্টেশন থেকে ওই চন্দ্রযানটির সঙ্গে মহাকাশ-বিজ্ঞানীরা অনবরত যোগাযোগ রেখে চলছিলেন। প্রসঙ্গত চান্দ্রায়ণ ১ গত বছর ২২ অক্টোবর দেশের একমাত্র স্পেস সেন্টার শ্রীহরিকোটা থেকে ছাড়া হয়েছিল। বছর ঘুরতে না ঘুরতেই এহেন যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হওয়ার ঘটনায় সিঁদুরে মেঘের সন্ধান পাচ্ছেন জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা।

ক্ষতিগ্রস্ত সৌন্দর্য

ক্রমাগত জঙ্গি কার্যকলাপ আর রাজনৈতিক দলগুলির উদাসীনতা — আমূল ক্ষতি করছে উত্তর-পূর্ব ভারতের অপরূপ প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের। এমনটাই মনে করছেন পরিবেশবিদ্‌রা। তাঁরা বলছেন, উত্তর-পূর্ব ভারতের পূর্ব হিমালয় পর্বতমালাকে বলা হয়, অন্তিম জৈবনিক সীমান্ত (লাস্ট বায়োলজিকাল ফ্রন্টিয়ার)। পরিবেশবিদদের অভিযোগ, ক্রমাগত জঙ্গি সংঘর্ষ ওই এলাকার জীব-বিজ্ঞান সংক্রান্ত পরিবেশকে ক্ষতিগ্রস্ত করছে। তাঁরা এই বিষয়ে আঙ্গুল তুলেছেন রাজনৈতিক নেতাদের দিকে। তাঁদের বক্তব্য, এখানকার (উত্তর-পূর্ব ভারতের) জৈব ভৌগোলিক পরিবেশ ও বৈচিত্র্যকে রক্ষা করার কোনও সদিচ্ছাই নেই রাজনৈতিক নেতাদের।

লক্ষ্য ভারত

১৯৮০-র আর্মস্ কন্ট্রোল অ্যাক্ট-এর চুক্তি ভেঙে পাকিস্তানের হারপুন ক্ষেপণাস্ত্রের আধুনিকীকরণ বিশেষজ্ঞদের মতে ভারতের বিরুদ্ধে জেহাদের লক্ষ্যেই। সম্প্রতি নিউইয়র্ক টাইমস মারফৎ জানতে পারা গেছে, পাকিস্তান হারপুন ক্ষেপণাস্ত্রের কোনও পরিবর্তন করতে পারে না। কিন্তু পাকিস্তান পূর্বের মতো এবারও ভারতের বিরুদ্ধে জেহাদের স্বার্থেই মাঝারি পাল্লার ওই বিধবংসী ক্ষেপণাস্ত্র সংযোজন করে। সেই সঙ্গে বিস্ফোরক বহন ও দূর থেকে লক্ষ্যবস্তুকে আঘাত হানার মতো ক্ষেপণাস্ত্রও যুক্ত করে। ওয়াশিংটনও এই খবরে বেজায় খাপ্পা হয়েছে। কিন্তু আসিফ আলি জারদারি, ইউসুফ রাজা গিলানীরা এই ঘটনায় কোনওরকম প্রতিক্রিয়া জানায়নি।

নাজেহাল

অতিরিক্ত যানবাহনের সংখ্যাই বাড়াচ্ছে শহরবাসীর ভোগান্তি। ১৫ মিনিটের পথ গাড়িতে যেতে সময় লাগছে আধ ঘন্টারও ওপর। কারণ, গাড়ির সংখ্যাধিক্য। কলকাতা পুরসভায় হিসাবে মহানগরের লম্বা রাস্তার মান প্রায় ১৮ শো কিলোমিটার। কিন্তু যানবাহনের সংখ্যা প্রায় ১১ লক্ষ। সহজ হিসাবে রাস্তার থেকে যানের পরিমাণ বেশি। হাওড়া, উত্তর-দক্ষিণ ২৪ পরগণা, হুগলী প্রভৃতি জেলা থেকে আসা গাড়িই মহানগর দাপিয়ে বেড়ায়। মহানগরের গাড়ির সংখ্যাটা অনেকটা এরকম — মালগাড়ি-৭৫ হাজার, মোটর গাড়ি তথা জিপের পরিমাণ ৪১,০০০, মোটর সাইকেল বা স্কুটারের পরিমাণ ৪৬,০০০, ট্যাক্সি ৪২,০০০। অটো রিক্সা-২০,০০০। মিনি বাস ১৭০০। বাস-১০,০০০, ট্র্যাক্টর - ৪৯০০, অন্যান্য-১৪,৫৬০০টি।

জাল নোট

দেশ জুড়ে জাল নোটের কারবার দিনকে দিন আরও বাড়ছে। খোদ কেন্দ্র সরকারও এবিষয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। তলায় তলায় জাল নোটের কারবারীরাও নিজেদেরকে আরও সংগঠিত করছে বলেও খবর। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ এবিষয়ে চিন্তা-ভাবনা চালালেও, বাজারের পরিস্থিতি এখনও অনুকূলে নয়। উল্টে বছর বছর বাড়ছে ১০০, ৫০০ ও হাজার টাকার জাল নোট। ২০০৭-এর হিসাবে দেখা যাচ্ছে দেশে ৬ কোটি ৬ লক্ষ ৭২ হাজারের ওপর জাল নোট ধরা পড়ে। ২০০৮-এ তা আরও বেড়েছে। ৭ কোটি ২০ লক্ষ ৬ হাজারের ওপর জাল নোট উদ্ধার হয়। চলতি বছরে অর্থাৎ, ২০০৯-এ গত তিন মাসের হিসাবে ১ লক্ষ ৬৮ হাজারের ওপর জাল নোট এখনও পর্যন্ত ধরা পড়েছে।

মগজ ধোলাই

ভারতের মাটি থেকেই মগজ ধোলাই। লস্কর-এ তৈবার একুশ সদস্য এই কাজেই ভারতে আসে। শুধু তাই নয়, টার্গেট পূরণে লখনউ বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্ত্তিও হয় তারা। সদ্য গ্রেপ্তার হওয়া লস্কর এ তৈবার সদস্য মহম্মদ অসলমেরই টিম ওই ২১ ছাত্র। উত্তরপ্রদেশের সন্ত্রাস দমন শাখা তাদের সন্ধান চালাচ্ছে। লখনউ বিশ্ববিদ্যালয়ের এই ঘটনা দেশজুড়ে আবারও চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছে। প্রশ্ন উঠেছে উত্তরপ্রদেশ সরকারের নিরাপত্তার ফাঁক-ফোকর নিয়েও। সেই সঙ্গে লখনউ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে। ওই ২১ জন আরবি ভাষায় স্নাতকোত্তর শ্রেণীতে ভর্তি হয়।

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

দুর্নীতি দমনে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি

সম্প্রতি সিবিআই ও রাজ্য দুর্নীতি দমন বিভাগগুলির প্রধানদের বার্ষিক সম্মেলন নয়াদিল্লীতে হইয়া গেল। এই সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রী ডঃ মনমোহন সিং দুর্নীতিপরায়ণদেরকে তীব্র ভাষায় আক্রমণ করিয়াছেন। বলিয়াছেন, দুর্নীতির জন্য কার্যত দেশের সার্বিক উন্নয়ণই থমকাইয়া আছে। প্রধানমন্ত্রীর আরও অভিযোগ হইল, 'রুল অব ল' অর্থাৎ আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করিবার পথে দুর্নীতিই হইল প্রধান অন্তরায়। দুর্নীতি দমন করিতে যাইয়া সি বি আই এবং রাজ্য দুর্নীতি দমন বিভাগগুলি শুধু চুনোপুঁটিদেরকেই ধরিতেছে। রাঘব বোয়ালরা ধরা-ছোঁওয়ার বাহিরে রহিয়া যাইতেছে। ফলে কাজের কাজ হইতেছে না। ঘটনা হইল, প্রধানমন্ত্রীর মুখে এইসব কথা নতুন নহে। স্বাধীন ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু যেমন নিয়মিতভাবে দুর্নীতি দমন করিবার কথা বলিতেন, তাঁহার পরবর্তী সব প্রধানমন্ত্রীই তেমন দুর্নীতি দমনের কথা বলিয়া থাকেন। বর্তমান প্রধানমন্ত্রীও এই ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম নহেন। বস্তুত দেশের প্রত্যেক প্রধানমন্ত্রী এবং রাজ্যগুলির মুখ্যমন্ত্রী দুর্নীতির বিরুদ্ধে কথা বলেন এবং জানাইয়া দেন যে, তাঁহারা সবাই দুর্নীতি দমনে বদ্ধ পরিকর। সত্য কথা বলিতে কী, ইহা একটি রুটিন কাজে পরিণত হইয়াছে।

প্রতিটি রাজ্যেই দুর্নীতি দমন বিভাগ রহিয়াছে। এবং ইহাও ঘটনা যে প্রতিটি রাজ্যেই ওই দুর্নীতি দমন বিভাগগুলিকে হয় অকেজো করিয়া রাখা হয়, কিংবা এমন সব ব্যক্তিকে ওই বিভাগের দায়িত্ব দেওয়া হয় যাহারা ওই দায়িত্ব পাইবার উপযুক্তই নহেন। দায়িত্বপ্রাপ্তগণ নিজেরাই যদি হন দুর্নীতিপরায়ণ, কিংবা দুর্নীতি দমন করিতে হইলে যে সততা, ন্যায়নিষ্ঠা ও কর্তব্যপরায়ণতা ও সাহসিকতার প্রয়োজন, তাহার যদি অভাব থাকে, তবে দুর্নীতি কীভাবে রোধ করা যাইবে? বস্তুত, রাজনৈতিক সর্বোচ্চ প্রভুরাই চাহেন না যে সরকারি প্রশাসন দুর্নীতিমুক্ত হউক। বরং, কোনও কোনও রাজনৈতিক কর্তৃপক্ষও (মুখ্যমন্ত্রী কিংবা অন্য কোনও মন্ত্রী যিনি সাধারণের কাছে 'হেভিওয়েট' মন্ত্রী বলিয়াই পরিচিত) চাহেন যে রাজ্যের বিরোধী দলের নেতা-কর্মীদের বিরুদ্ধে দুর্নীতিপরায়ণ কর্মীদেরই সর্বাপেক্ষা বেশি করিয়া কাজে লাগানো সম্ভব। তাঁহারা ইহাও চাহেন যে তাঁহাদের অধীনস্থ প্রশাসন ও পুলিশ প্রশাসন শাসক দলের প্রতি 'কমিটেড' বা অনুগত থাকুক। কেননা ইহাতেই তাঁহাদের রাজনৈতিক স্বার্থ সর্বাপেক্ষা বেশি চরিতার্থ হইতে পারে। এবং কার্যত তাহা তাঁহারা করিয়াও থাকেন। সংশ্লিষ্টরাও ক্ষুদ্র, তুচ্ছ ও সংকীর্ণ লাভের আশায় শাসক দলের নেতাদেরকে প্রভু বলিয়া মনে করেন এবং এই প্রভুদের পাদোদক পর্যন্ত সেবন করিতেও প্রস্তুত থাকেন। এই উর্বর ক্ষেত্রেই দুর্নীতির বীজ পড়িয়া থাকে এবং তাহা হইতে যে চারাগাছ জন্মায় তাহাই পরে ফলে-ফুলে-শাখায় মহীরুহ হইয়া উঠে।

ঘটনা হইল, দুর্নীতির এই বিষবৃক্ষটিকে সময়ে অনায়াসেই উৎখাত করা যায়। প্রবাদ বাক্য হইল — 'সময়ে এক ফোঁড়, অসময়ের দশ ফোঁড়'। অর্থাৎ অসময়ে উৎখাত করাটি অসম্ভব হইয়া পড়ে। বিশ্বের বৃহত্তম গণতান্ত্রিক দেশ ভারতে স্বাধীনোত্তর কালে দুর্নীতির এই বিষবৃক্ষটি ধীরে ধীরে কিন্তু নিশ্চিত গতিতেই বাড়িয়াছে। যে যায় লঙ্কায় সেই হয় রাবণ — এই প্রবাদ বাক্যকে অনুসরণ করিয়াই যেন যাহারা ক্ষমতায় বসিয়াছেন, তাহারাই সঙ্কীর্ণ স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে বিষবৃক্ষের চারাটির পরিচর্যা করিয়াছেন। প্রধানমন্ত্রী ডঃ মনমোহন সিং ইচ্ছা করিলেই তাহা হইবে না, তবে তিনি যদি সত্য সত্যই দুর্নীতি দমন করিতে আক্ষরিক অর্থেই আগ্রহী থাকেন এবং এই মুহূর্ত হইতে শুরু করেন তবেই ভবিষ্যতে এই প্রয়াসের ফল লাভ সম্ভব। যে ঝাঁঝালো সুরে তিনি দুর্নীতির বিরুদ্ধে কথা বলিয়াছেন, সেই দুর্নীতির দায়ভাগ কিন্তু প্রধানমন্ত্রী হিসাবে তাঁহাকেও বহন করিতে হইবে। তাই সর্বাগ্রে প্রয়োজন দুর্নীতিপরায়ণদের বিরুদ্ধে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা। প্রশ্ন হইল, তিনি কতটা অগ্রসর হইবেন? নাকি ঝাঁঝালো সুরে সতর্ক করাই সার হইবে?

জাতীয় জাগরণের মন্ত্র

আমাদের সংস্কৃতির সব প্রাচীন ও প্রাণদায়ী লক্ষণগুলিকে নতুন করে সজীব করে তোলার কাজ আমাদের বর্তমান জাতীয় পরিপ্রেক্ষিতেই একান্ত জরুরী ও সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে পড়েছে। আমাদের সাংস্কৃতিক দৃষ্টিভঙ্গী যা মানুষে মানুষে ভালোবাসা ও সম্প্রীতির সত্যিকারের ভিত্তির সন্ধান দেয়, যা সম্পূর্ণ জীবন দর্শনের আধার, যুদ্ধ দীর্ণ বর্তমান জগতের সামনে তাকে প্রভাবী রূপে তুলে ধরা দরকার। এই মহান বিশ্ব দৌত্যে সফল হতে হলে আমাদের নিজেদের আগে উপযুক্ত মানের করে তুলতে হবে। অন্যের হুবহু অনুকৃতি হওয়ার চেয়ে বড় জাতীয় অবমাননা আর কিছু হতে পারে না। আমাদের স্মরণ রাখতে হবে, অন্ধ অনুকরণ অগ্রগতি নয়। এটা আমাদের আত্মিক পরাধীনতার দিকে নিয়ে যায়!

অবশ্য আমরা বিশ্বাস করি যে, বর্তমান বিপথগামিতা এবং ভুল ধারণাগুলি কেবল একটি ক্ষণস্থায়ী পর্যায়মাত্র। আমাদের সংস্কৃতির মূল অমরত্বের উৎস এত দৃঢ়ভাবে ও এত গভীরে প্রোথিত যে তা সহজে শুকিয়ে যাওয়ার নয়।

— শ্রীগুরুজী

পশ্চিমবঙ্গে রাষ্ট্রপতি শাসন জারি করা উচিত?

ডঃ নির্মলেন্দু বিকাশ রক্ষিত

বত্রিশ বছর পর পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্টের নির্বাচনী বিপর্যয় ঘটেছে। ৪২টা আসনে লড়াই করে বামফ্রন্ট পেয়েছে মাত্র ১৫টা আসন। গত লোকসভা নির্বাচনে কংগ্রেস পেয়েছিল ৬টা আসন, তৃণমূল কংগ্রেস পেয়েছিল ১টা। বাকি ৩৫টাই ছিল বামফ্রন্টের দখলে। এবার কিন্তু কংগ্রেস-তৃণমূল - এস ইউ সি আই জোট পেয়েছে ২৬টা আসন (তৃণমূল - ১৯, কংগ্রেস - ৬ এবং এস ইউ সি আই - ১)। ৪২টা আসনের মধ্যে বামফ্রন্টের বড় শরিক সি পি আই (এম) পেয়েছে মাত্র ৯টা আসন, তার সঙ্গীরা দখল করেছে ৬টা আসন। (লোকসভা ভোটের পর রাজ্যের পুরসভাগুলির ও বিধানসভার উপনির্বাচনেও সিপিএম তথা বামফ্রন্টের বিপর্যয় ঘটেছে)।

অবশ্য এটা বিস্ময়কর কিছু নয়। বেশ কিছুকাল ধরেই বামফ্রন্টের দুঃসময় চলছে। বিধানসভার ৩টে উপনির্বাচনে ফ্রন্ট পেয়েছিল মাত্র ১টি আসন। আর পঞ্চায়েতের নির্বাচনে যেমন তার ভরাডুবি হয়েছে, তেমনি বিভিন্ন স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালনা সমিতি এবং ছাত্র-সংসদের নির্বাচনেও ফ্রন্টের বিপর্যয় ঘটেছে। অবশ্যই সিঙ্গুর-নন্দীগ্রামের বিদ্রোহ, সি পি আই (এম) নেতাদের হঠকারিতা, দম্ভ, অত্যাচার ও লোভের রাজনীতি তাঁদের ডুবিয়েছে। বিশেষ করে, বুদ্ধি জীবীদের আন্দোলনও জনমানসে বিরাট প্রভাব বিস্তার করেছিল। সম্ভবত সেইসঙ্গে ছিল দলীয় অন্তর্ঘাতও।

এটা লক্ষণীয় যে, এবার সি পি আই (এম) ও তার সঙ্গীদের অনেকেরই পরাজয় ঘটেছে শোচনীয়ভাবে — বিরাট ব্যবধানে জয়ী হয়েছেন তাদের প্রতিদ্বন্দ্বীরা। এমনকী, অনেক ডাকসাইটে ও দোর্দণ্ডপ্রতাপ নেতাও বিশাল ব্যবধানে পরাজিত হয়েছেন। আব্দুল রেজ্জাক ১,৩৬,২৮০ ভোটে, তড়িৎ তোপদার ১,৫৬,২৭২ ভোটে, সুদিন চ্যাটার্জী ২,২২,৯১১ ভোটে, শমিক লাহিড়ী ১, ৫২,৬৮৯ ভোটে, লক্ষ্মণ শেঠ ১,৭২,৯৫৮ ভোটে, রবীন দেব ২,১৯,৫৭০ ভোটে এবং মহম্মদ সেলিম ১, ০৯, ২৭৮ ভোটে পরাজিত হয়েছেন। বাসুদেব বর্মণ, অসীম বালা প্রমুখ অনেক বিরাট মাপের নেতাও হেরেছেন প্রায় লাখখানেক ভোটে। অথচ বহু বিরোধী নেতা পরাজিত হয়েছেন অল্প ভোটে। এমনকী বিজেপি-র প্রার্থীরা গড়ে ৫০/৬০ হাজার ভোট পেয়েছেন সব কেন্দ্রে।

এক কথায় বলা যায় পশ্চিমবঙ্গের লালদুর্গ এতদিনে নড়বড়ে হয়ে গেছে। জনরোষে কেঁপে উঠেছে বাম জমানা। আমরা এখন দাঁড়িয়ে আছি নতুন যুগের সিংহদুয়ারে।

সেইজন্যই একটা প্রস্তাব এসেছে — বিধানসভার ভোট এগিয়ে আনা হোক। অর্থাৎ এই রাজ্যে ৩৫৬ নং অনুচ্ছেদের মাধ্যমে রাষ্ট্রপতি শাসন জারী করে নতুন করে বিধানসভা গঠন করা হোক, কারণ এই নির্বাচনেই প্রমাণিত হয়েছে যে, বাম-সরকারের পেছনে আদৌ জনসমর্থন নেই।

বিষয়টা নিয়ে অবশ্যই বিতর্ক থাকতে পারে। কিন্তু দূরদর্শনে যেভাবে কোনও কোনও বাম নেতা তীব্র আপত্তি জানিয়েছেন, তাতে কিন্তু বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেছি। বারবার মনে হয়েছে — দ্বিচারিতা এদের একেবারে মজ্জাগত ব্যাপার। সম্ভবত, নির্লজ্জ না হলে বাম-রাজনীতি করা যায় না।

তাঁদের বক্তব্য হল — নির্বাচনটা হয়েছে লোকসভার এবং তাতে বামফ্রন্ট অবশ্যই ভাল ফল করতে পারেনি। কিন্তু রাজ্য সরকার ক্ষমতায় বসেছে বিধানসভার নির্বাচনে সাফল্যের ফলে। সেক্ষেত্রে লোকসভার নির্বাচনে বিপর্যয়ের কারণে তাকে সরিয়ে দিতে হবে কেন? এটা একেবারে অগণতান্ত্রিক ও সংবিধান বিরোধী ব্যাপার হবে।

"জয়প্রকাশ নারায়ণ তখন একটা অগণতান্ত্রিক ও অদ্ভুত তত্ত্বের অবতারণা করে বলেছিলেন — এইসব রাজ্যের সরকারকে ভেঙে দিয়ে নতুন নির্বাচন করা হোক (কারণ ইন্দিরা বিরোধী হাওয়ায় সেগুলো বিরোধীদের দখলে চলে আসবেই)। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী চরণ সিং এই তত্ত্বই গ্রহণ করেছিলেন (জি এস পাণ্ডে কন্‌স্টিটিউশনাল ল অফ ইন্ডিয়া, পৃ ৪৭৭)। বামপন্থীরাও তাতে আহ্লাদিত হয়েছিলেন। এই যুক্তিটাই এখন বামেদের কাছে ব্যুমেরাং হয়ে ফিরে এসেছে। এতে এত উষ্মা, ক্ষোভ ও আপত্তি কেন?"

যুক্তিটা নির্ভুল। ১৯৭৭ সালে অনুরূপ পরিস্থিতিতে সংবিধান বিশেষজ্ঞ দুর্গাদাস বসু মন্তব্য করেছিলেন, লোকসভায় কোনও দলের বিপর্যয় ঘটলে, তার শাসনাধীন রাজ্য থেকে তাকে আদৌ বরখাস্ত করা যায় না — এক্ষেত্রে বরখাস্ত করার যুক্তিটা 'Political flaw'। তার কারণ হল, লোকসভা ও বিধানসভার নির্বাচনে 'ইস্যু'গুলো ভিন্ন ধরনের হয়ে থাকে। তার ভিত্তিতেই নির্বাচিত রাজ্য সরকার ও কেন্দ্রীয় সরকার ক্ষমতায় বসে। তিনি লিখেছেন, 'In an election to the state legislature, the issues involved are primarily of local interests, while all India considerations act at an election to parliament' — (ইন্ট্রোডাক্‌শান টু দ্য কন্‌স্টিটিউশান অফ ইন্ডিয়া, পৃ : ৩০৭)। সুতরাং যেই দল বা গোষ্ঠী রাজ্যে ক্ষমতায় আছে, মাঝখানে লোকসভার নির্বাচনে তার বিপর্যয় ঘটলে তাকে সরিয়ে দেওয়ার প্রশ্ন ওঠে না।

কিন্তু পূর্বোক্ত বাম নেতাদের প্রশ্ন করি — এই বোধোদয় ১৯৭৭ সালে তাঁদের হয়নি কেন? পশ্চিমবঙ্গসহ নয়টা রাজ্যে তখন ইন্দিরা বিরোধী হাওয়ার কারণে লোকসভা নির্বাচনে কংগ্রেসের বিপর্যয় ঘটেছিল। এই যুক্তি দেখিয়েই কিন্তু তখন সেই রাজ্যগুলোতে কেন্দ্রের জনতা সরকার ৩৫৬ নং অনুচ্ছেদের মাধ্যমে সরকারকে বরখাস্ত করে রাষ্ট্রপতি শাসন জারি করেছিল। বন্ধু সরকারের সেই কীর্তিতে উল্লসিত হয়ে তখন বাম নেতারা উর্দ্ধবাহু নৃত্য করেননি? তাঁদের স্বার্থসিদ্ধি ঘটলে যেটা গণতন্ত্রসম্মত ও সাংবিধানিক ব্যাপার, সেটাই ভিন্ন পরিস্থিতিতে হবে নিন্দনীয় ও ঘৃণ্য পদক্ষেপ?

এটা ঠিক যে, ৩৫৬ নং অনুচ্ছেদকে বারবার রাজনৈতিক স্বার্থেই ব্যবহার করা হয়েছে। এস এল সিক্রি মন্তব্য করেছেন — Art. 356 has been more abused than used' — (ইণ্ডিয়ান গভর্ণমেন্ট অ্যান্ড পলিটিক্স, পৃ : ৯৮)। ডঃ এস আর নাকাডেও তাঁর বিখ্যাত প্রবন্ধে (আর্টিকেল ৩৫৬ অফ দ্য কন্‌স্টিটিউশান', ইউনিয়ান স্টেট রিলেশান্স) লিখেছেন যে, প্রায় সব ক্ষেত্রেই কেন্দ্রের কংগ্রেস সরকার এই অস্ত্রটা রাজনৈতিক কারণে ব্যবহার করেছে। আরও স্পষ্ট করে ডঃ শ্রীরাম মহেশ্বরী দেখিয়েছেন যে, এই ব্যাপারে কোনও সুস্পষ্ট নীতি বা বিধি গৃহীত হয়নি — অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ভিন্ন দলের রাজ্য সরকারকে বিতাড়িত করার জন্যই কেন্দ্রের কংগ্রেস সরকার এভাবে রাষ্ট্রপতি শাসন জারি করেছে (প্রেসিডেন্টস রুল ইন ইন্ডিয়া)। এই সব ক্ষেত্রে জড়িত ছিল তার রাজনৈতিক স্বার্থই।

কিন্তু একটা কথা স্পষ্ট করে বলি। কংগ্রেস বারবার এই ক্ষমতার অপপ্রয়োগ ঘটালেও, একসঙ্গে একাধিক অকংগ্রেসী সরকারকে বরখাস্ত করেনি। কিন্তু জনতা সরকার ১৯৭৭ সালে ক্ষমতায় বসেই একসঙ্গে নয়টা কংগ্রেস শাসিত রাজ্যে এই ক্ষমতা প্রয়োগ করেছে। ডঃ অনুপচাঁদ কাপুরের ভাষায় — এই রাজ্যগুলো হয়ে উঠেছিল কেন্দ্রীয় অপশাসনের সাম্প্রতিক বলি — 'the latest victim' — (দ্য ইন্ডিয়ান পলিটিক্যাল সিস্টেম, পৃ : ১৯১)। অনুরূপভাবে ডঃ জে সি জোহারীও মন্তব্য করেছেন, কেন্দ্রীয় ক্ষমতার অপব্যবহারের 'notorious instance' হ'ল ১৯৭৭ সালের এই ঘটনা — (ইন্ডিয়ান গভর্ণমেন্ট অ্যান্ড পলিটিক্স, পৃ :৫৫৯)। তখন কিন্তু কেন্দ্রের জনতা সরকারের এই জঘন্য ও ঘৃণ্য কাজের তারিফ করেছিল বাম নেতারা। তাদের যুক্তি ছিল — এই সব রাজ্যে কংগ্রেস বিপর্যস্ত হয়েছে লোকসভা নির্বাচনে, জনমতের বিচারে তাই তাদের ক্ষমতায় থাকার অধিকার নেই। তাহলে সেই একই যুক্তিতে এই রাজ্যের বাম সরকারকেও সরানো যায়। ইতিহাসের কি এটাও শিক্ষা নয়?

আসলে, তখন জয়প্রকাশ নারায়ণ ইন্দিরা গান্ধীর স্বৈরাচারিতার বিরুদ্ধে গণতন্ত্রের দাবীতে একটি দেশব্যাপী আন্দোলন শুরু করেছিলেন, তাতে যুক্ত হয়েছিলেন বামপন্থীরাও। লোকসভা নির্বাচনে কংগ্রেস তখন বিধ্বস্ত হয়েছিল — বিভিন্ন রাজ্যে এই দলের ফল হয়েছিল শোচনীয়। জয়প্রকাশ নারায়ণ তখন একটা অগণতান্ত্রিক ও অদ্ভুত তত্ত্বের অবতারণা করে বলেছিলেন — এইসব রাজ্যের সরকারকে ভেঙে দিয়ে নতুন

(এরপর ৪ পাতায়)

বৈদিক ভিলেজ কাণ্ড

(১ পাতার পর)

কী করতে চায় তা আজও স্পষ্ট নয়। শিল্প শিল্প করে স্লোগানবাজি করার আগে মুখ্যমন্ত্রী ও শিল্পমন্ত্রীর কর্তব্য ছিল শিল্পের প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো গড়ে তোলার। রাজ্যে বিদ্যুৎ সরবরাহের এমন বেহাল অবস্থায় শিল্প-কারখানা গড়তে কেউই যে আগ্রহী হবে না তা এই দুই মন্ত্রীর অজানা ছিল না। কিন্তু এই বিষয়টিকে আড়াল করে শিল্প নিয়ে রাজনীতি করতে গিয়ে তাঁরা বামফ্রন্টকেই ডুবিয়ে দিয়েছেন।

বর্ধনের কথা তেতো লাগলেও সত্য। একটি মৃতদেহে পচন ধরলে সুগন্ধি ছড়িয়ে পচা দুর্গন্ধ আড়াল করা যায়। কিন্তু শত শত পচা লাশের দুর্গন্ধ দূর করা যায় না। সি পি এমের আঙিনায় শত শত দুষ্কর্মের লাশ পড়ে আছে। তাই নাকে রুমাল চাপা দিয়ে পালানো ছাড়া দ্বিতীয় কোনও পথ আলিমুদ্দিনের ম্যানেজারদের সামনে খোলা নেই। সর্বস্তরে ব্যর্থতার দায়ে শুধু মুখ্যমন্ত্রীকেই নয়, প্রয়োজন গোটা মন্ত্রীসভাকেই বরখাস্ত করা। সিপিএম সহ বামফ্রন্টের শরিক দলের সব নেতা মন্ত্রীকেই জনতার আদালতে দাঁড় করিয়ে বিচার করার সময় এসেছে। বাংলার মানুষের জানার অধিকার আছে ক্ষমতায় থাকার সুবাদে তাঁরা বিপুল বিত্ত-সম্পত্তি কীভাবে অর্জন করেছে। বৈদিক রিসর্ট কাণ্ডে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা তদন্ত চেয়েছেন। কিন্তু যদি তদন্তে দেখা যায় সেখানে সিপিএম-তৃণমূল চোরে চোরে মাসতুতো ভাই তখন নেত্রী কী ব্যবস্থা নেন সেটাই দেখার। কারণ, তিনি কেন্দ্রীয় তদন্তের কথা বলছেন আবার অন্যদিকে স্থানীয় তৃণমূল বিধায়ককে ক্লিনচিট দিচ্ছেন। তৃণমূল বিধায়কের সঙ্গে বৈদিক রিসর্টের পরিচালকদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের কথা স্থানীয় মানুষেরাই বলেছেন। বিধায়ক নিজেও স্বীকার করেছেন তাঁর ভাইকে রিসর্ট কর্তৃপক্ষ এই সু-সম্পর্কের জন্যই চাকরি দিয়েছেন। অথচ তিনি নাকি বে-আইনি জমি দখলের ব্যাপারটা জানতেন না। এই কথাটা কি বিশ্বাসযোগ্য?

ছাত্রের ছদ্মবেশে বাংলাদেশী মৌলবাদী

(১ পাতার পর)

আসছি, ইসলামি মৌলবাদীরা এদেশে সন্ত্রাস ছড়িয়ে দিতে মাদ্রাসাকে ব্যবহার করছে। অথচ কোনও রহস্যজনক কারণে সরকার মৌন অবলম্বন করেছে। এখনও কোনও পরিস্কার বক্তব্যও সরকার পেশ করেনি।" শ্রীপাঠক মাদ্রাসার পরিচালন কর্তৃপক্ষকে সত্বর গ্রেপ্তার করার দাবী জানিয়েছেন।

বিশ্বস্ত সূত্রে জানা গিয়েছে, ওই মাদ্রাসায় দেশবিরোধী কার্যকলাপের অভিযোগ অনেক পুরনো। অসম জাতীয়তাবাদী যুব-ছাত্র পরিষদ আগেই অভিযোগ করেছিল, 'সংশ্লিষ্ট মাদ্রাসায় মৌলবাদী এবং জেহাদি কাজকর্ম দীর্ঘদিন ধরে চলছে।' অনেকদিন পর ছাত্রদের পরিচয় জানতে চাওয়া হয়েছিল। এখন মাদ্রাসাটি বন্ধ করার দাবী উঠেছে। জোড়হাট থেকে বিশ্বস্ত সূত্রে পাওয়া এক সংবাদে জানা গেছে যে, অসমের সংরক্ষিত বনাঞ্চলে বাংলাদেশী মুসলমানরা ডেরা গেড়েছে। এই বনাঞ্চল রয়েছে দিফু সংরক্ষিত বনাঞ্চলে। সেখানে বাংলাদেশীরা কৃষিকাজ ও কনস্ট্রাকশন কাজে যোগ দিয়েছে। তারপর বসতি এবং বসতি গড়ে তোলার পরে মাদ্রাসাও তৈরি হয়ে রমরমিয়ে চলছে। প্রতি বছর কমপক্ষে পাঁচশ বাংলাদেশী ছাত্র মাদ্রাসায় ধর্মীয় মৌলবাদের ট্রেনিং নেয় এবং তারপর হাতে কলমে তার অনুশীলন করতে প্রথমে অসম ও পরে পার্শ্ববর্তী রাজ্যগুলি ও সারা ভারতে ছড়িয়ে পড়ে। এরকম তিনটি মাদ্রাসা রয়েছে গেলাজান, বিদয়াপুর এবং দয়ালপুর এলাকায়। অসম এবং নাগাল্যান্ডের মধ্যে সীমা-বিবাদ থাকায় কোনও রাজ্যের প্রশাসনই ওইসব মাদ্রাসা নিয়ে তেমন গা করেনি। দুই রাজ্যের মধ্যে স্বাক্ষরিত এক চুক্তিতে ওখানে স্থিতাবস্থা বজায় রাখার কথা হওয়ায় বাংলাদেশীদের পোয়া-বারো হয়েছে।

৯৪০ হিন্দু মেয়ে নিখোঁজ

(১ পাতার পর)

করে। তখনই সব তথ্য ফাঁস হয়ে যায়।

সরকার পক্ষের উকিল মহম্মদ আনসারি বলেন, মেয়ে দুটিকে পরিকল্পনা করে জোরপূর্বক ধর্মান্তরিত করা হয়েছে। এক পিটিশনে পাল্লিক্কালের জ্যাকব থমাস, কোট্টারাক্কারার কোল্লাম, পেরুরকোডার কে মাধবন এবং তিরুঅনন্তপুরমের এক অভিভাবক কেরল হাইকোর্টকে জানান যে তাদের মেয়েদেরকে জোর করে ধর্মান্তরিত করা হয়েছে। আটক করে একাজ করছে পীঠার এলাকার শাহেনশাহ। মেয়েরা সেখানে একটা প্রজেক্ট সম্পূর্ণ করার কাজ করছিল। হাইকোর্টে ওই মেয়েদের উপস্থিত করা হলে (হেবিয়াস কর্পাস পিটিশনে) তারা জানায় যে, তাদেরকে কোঝিকোড়ের পশ্চিম চেলারাই এলাকায় এক পরিত্যক্ত বাড়িতে রাখা হয়েছিল। তারপর জোরজবরদস্তি করে তাদেরকে ইসলামে ধর্মান্তরিত করা হয়। আদালত মেয়েদেরকে তাদের মা-বাবার সঙ্গে পাঠিয়ে দিলেও নির্দেশ দিয়েছে— মেয়েরা নিজের ইচ্ছেমতো উপাসনা করতে ও খাবার খেতে পারবে।

তিরুঅনন্তপুরম্-এর ক্যান্টনমেন্ট পুলিশের অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার গোপকুমার হিন্দু মেয়েদের ইসলামে ধর্মান্তরিত করার বিষয়ে তদন্ত করছেন। তিনি বলেছেন, 'বিগত পাঁচ বছরে কেরলে ৯৪০ জন মেয়েকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। তারা হারিয়ে গেছে। তবে তদন্তের পরই সত্য প্রকাশ পাবে।' এদিকে পুলিশের কাছে খবর, হিন্দু সংগঠনগুলোও হিন্দু মেয়েদের ইসলামে ধর্মান্তরকরণের প্রতিরোধ করতে মাঠে নামছে।

সেপ্টেম্বর মাসের গোড়ার দিকেই পুলিশ হাইকোর্টে এনিয়ে একটা রিপোর্ট দাখিল করবে বলে জানা গেছে।

কেরল পুলিশ অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে হিন্দু মেয়েদেরকে মুসলমান করার খবরের সত্যাসত্য নিয়ে মন্তব্য করতে অস্বীকার করেছে। এদিকে গত জানুয়ারিতেই একশ্রেণীর সংবাদ মাধ্যমে খবর বেরিয়েছিল যে, ইসলামি রোমিওরা কমপক্ষে ৪০০০ মেয়েকে পরিকল্পিতভাবে ধর্মান্তরিত করেছে।

গো-হারা সি পি এম

(১ পাতার পর)

এমনই দাপট যে উন্নয়নের কাজে শেষ পর্যন্ত মন দিলেও, ভোটের বাজারে থৈ খুঁজে পাচ্ছে না সিপিএম নেতৃত্ব। এই বর্ধমান থেকেই একদা সিপিএমের হয়ে জিতেছিলেন সৈফুদ্দিন চৌধুরী। পরে জেতেন আবু আয়েশ মন্ডল। কিন্তু পরে এঁরা দুজনেই দলত্যাগ করেন। রাজনৈতিক মহলের অনুমান, মঙ্গলকোট উত্তর পরিস্থিতিতে, এই দুই প্রাক্তন সাংসদের প্রভাবে বেশ কিছুটা বেসামাল হয়ে পড়েছে সিপিএম।

একই হাল মেদিনীপুরেতেও। তবে সেখানে সাম্প্রতিককালে দু-একটি স্কুলের পরিচালন সমিতির নির্বাচনে জিতে গেছে সিপিএম। কিন্তু জয়ের মার্জিন আগের তুলনায় বেশ কমে গিয়েছে।

সিপিএমের এই হাঁড়ির হাল একেবারে চূড়ান্ত রূপ ধারণ করেছে হুগলিতে। সেখানে একের পর এক সমবায় এবং স্কুল নির্বাচনে ভরাডুবির ফলে বহু জায়গায় সিপিএম নেতৃত্ব এখন আর প্রার্থী দিতে চাইছে না। কিছু জায়গায় তো আর প্রার্থী দিতে পারছেও না। সিপিএমের খাসতালুক ধনেখালি এবং জাঙ্গিপাড়া সমবায় সমিতির নির্বাচনে সিপিএম প্রার্থী না দেওয়ায় বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জিতে যায় বিরোধীরা। ধনেখালির দশঘরা হাইস্কুলে ৩০ বছর ধরে দখলে থাকা পরিচালন সমিতির নির্বাচনে একই দশা হয় সিপিএমের।

একইভাবে বেলমুড়ি রাধাবল্লভপুর গোবরআড়া কৃষি উন্নয়ণ সমিতি, জাঙ্গিপাড়া বাগান্ডা হাইস্কুল পরিচালন সমিতি, বলাগড় গোঁসাইডাঙ্গা উচ্চ বিদ্যালয় পরিচালন সমিতি এবং চুঁচুড়ার কামারপাড়া দেশবন্ধু মেমোরিয়াল হাইস্কুল পরিচালন সমিতিতে প্রার্থীই দিতে পারেনি সিপিএম।

পশ্চিমবঙ্গে রাষ্ট্রপতি শাসন

(৩ পাতার পর)

নির্বাচন করা হোক (কারণ ইন্দিরা বিরোধী হাওয়ায় সেগুলো বিরোধীদের দখলে চলে আসবেই)। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী চরণ সিং এই তত্ত্বই গ্রহণ করেছিলেন (জি এস পাণ্ডে কন্‌স্টিটিউশনাল ল অফ ইন্ডিয়া, পৃ : ৪৭৭)। বামপন্থীরাও তাতে আহ্লাদিত হয়েছিলেন। এই যুক্তিটাই এখন বামেদের কাছে ব্যুমেরাং হয়ে ফিরে এসেছে। এতে এত উষ্মা, ক্ষোভ ও আপত্তি কেন?

বিশেষ করে, এই রাজ্যে রাষ্ট্রপতি শাসন জারি করা তো যায়ই। সাম্প্রতিক সব নির্বাচনেই বামপন্থীরা ধরাশায়ী হয়েছে। তাতেই বোঝা যায় যে, জনমানস থেকে এই নেতারা বহু দূরে সরে গেছেন। আর সিঙ্গুর, নন্দীগ্রাম, লালগড় ইত্যাদি ঘটনাবলী বামফ্রন্টের গলিত-দূষিত কদর্য রূপটাকে প্রকট করে তুলেছে। পুলিশ ও চটি পরা ক্যাডাররা পুলিশের উর্দি পরে হত্যা, ধর্ষণ ইত্যাদি চালিয়েছে। পুলিশ চড় খেয়েছে, সি আর পি এফ-র সঙ্গে তাদের বিরোধ দেখা দিয়েছে। নন্দীগ্রামে ১৪ জনেরও বেশি মানুষ নিহত হয়েছেন, ধর্ষিতা হয়েছেন তাপসী মালিক, রাধারাণী সিটরা। বিরোধীদের — এমন কী, নিরপেক্ষ বুদ্ধিজীবীদের প্রতিও অত্যাচার করা হয়েছে। বারবার ১৪৪ ধারা জারী করে সরকার হাইকোর্টের ভর্ৎসনা কুড়িয়েছে। প্রাক্তন স্বরাষ্ট্রসচিব মুখ্যমন্ত্রীর মিথ্যাচার ফাঁস করে দিয়েছেন। লালগড়ে পুলিশ মেয়েদের উলঙ্গ করে দেখেছে সত্যিই তারা নারী কি না। রাস্তা কেটে, গাছ ফেলে নরনারী তাই জায়গাটাকে বিচ্ছিন্ন করে সমান্তরাল শাসন চালাচ্ছেন। এবারের সরকারের লক্ষ্য হল নয়াচরে দূষণ সৃষ্টি করে মানুষের সর্বনাশ করা, আর কৃষিকে ধ্বংস করে দুর্ভিক্ষকে ডেকে আনা।

ক্ষমতায় থাকার নৈতিক অধিকার তার আছে?

রাজ্য রাজনীতি

রাজ্যের রাজনৈতিক দলগুলির ছিন্নমস্তা অবস্থা

নিশাকর সোম

সেপ্টেম্বরের ৫-৬ তারিখে সিপিএম-এর পলিটব্যুরোর সভা। এই সভায় পশ্চিমবঙ্গ এবং কেরল সহ বিগত লোকসভার নির্বাচনের পরবর্তী পরিস্থিতি ও সাংগঠনিক ব্যবস্থা নিয়ে আলোচনা হওয়ার কথা। পলিটব্যুরোর মতামত ইতিমধ্যে বিভিন্ন দৈনিকে প্রকাশ পেয়েছে। পলিটব্যুরো মনে করে পশ্চিমবঙ্গের পার্টিতে নীচের তলায় ব্যাপক ভাবে "অ-রাজনৈতিক" ভোটকর্মী ঢুকে পড়েছে। দুর্নীতি শিকড় গেড়ে বসেছে। কোনও স্তরেই পার্টি নেতৃত্বের কর্তৃত্ব নেই। ফলে সর্বস্তরে একটা বেপরোয়া ভাব। সকল কমিটিতেই মতানৈক্য প্রবল। রাজ্য কমিটিতে বিশেষ করে, রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলী এক বহুমতের গোষ্ঠীতে পরিণত হয়েছে। রাজ্য সম্পাদক বিমান বসু তাঁর প্রকাশ্য লেখাতে লিখেছেন যে, বহুপূর্বেই যাদের পার্টি সভ্যপদ দেওয়া হয়েছে — এরা কেন সভ্যপদ পেলো। বিমানবাবুর ইঙ্গিত যে, প্রয়াত অনিল বিশ্বাসের আমল থেকেই শুরু হয়েছে পার্টির পচন! রাজ্য মন্ত্রিসভার বিভিন্ন মন্ত্রী বিভিন্ন এন জি ও-এর সঙ্গে পরোক্ষভাবে জড়িত। কোনও কোনও মন্ত্রীর স্ত্রীর নামেও এন জি ও রয়েছে। এমন মন্ত্রীও আছেন, যিনি স্ত্রীর চশমা কেনার জন্য সরকারি তহবিল থেকে হাজার হাজার টাকার বিল মঞ্জুর করিয়েছেন। অনিল বিশ্বাসের আমলেই জনৈক মন্ত্রীর নাকি একটি কমপিউটার কোম্পানীর জিনিস ক্রয়ের ব্যাপারে স্বচ্ছতার অভাব ছিল।

পলিটব্যুরো মনে করে পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য-পার্টিতে দুর্নীতি রন্ধ্রেরন্ধ্রেপ্রবেশ করেছে। কেরলে বর্তমানে খোদ পার্টির রাজ্য সম্পাদক পিনারাই বিজয়নের বিরুদ্ধে দুর্নীতির তদন্ত চলছে। ২০১১ সালে বিধানসভা নির্বাচনে যদি পার্টি সংখ্যাগরিষ্ঠতা হারায় তখন হাজার হাজার পার্টি কর্মী বিরোধী দলে চলে যাবেই। এখুনি তো বহু জেলার পার্টি কর্মীরা ভয়ে অথবা সুবিধার লোভে বিরোধী দলে ঢুকে পড়ছেন। পার্টি রাজ্য সম্পাদক বনাম মুখ্যমন্ত্রীর দ্বন্দ্ব প্রকটিত। মুখ্যমন্ত্রী বক্তৃতা করার পূর্বে রাজ্য সম্পাদক বা রাজ্যের অন্য পলিটব্যুরোর সদস্যদের সঙ্গে আলোচনার ধার ধারেন না। মুখ্যমন্ত্রী যৌথ কর্মপদ্ধতি কোনওদিনই মানেননি। ফলে পার্টি এবং মন্ত্রিসভায় বস্তুত সবাই বিরক্ত এবং তাঁর বদল চায়।

এছাড়া রাজ্যের সিপিএম-এর রাজ্য কমিটি বনাম জেলা কমিটির দ্বন্দ্ব এতই তীব্র যে, একে অপরের কর্তৃত্ব বা মতামতের মূল্য দেয় না! গোদের উপর বিষফোঁড়ার মতোন বউবাজারের উপনির্বাচনে পার্টি সমর্থিত নির্দল প্রার্থীর জামানত বাজেয়াপ্ত হওয়াতে কলকাতা জেলা কমিটিকে বিমানবাবু দায়ী করছেন। অপরদিকে কলকাতা জেলা কমিটি বিমানবাবুদের দায়ী করছে। উল্লেখ্য, বউবাজার নামের এই কেন্দ্রে এক নির্বাচনে অবিভক্ত কমিউনিস্ট পার্টির প্রার্থী মহঃ ইসমাইল ডাঃ বিধান চন্দ্র রায়কে প্রায় পরাস্ত করে দিতে গেছিলেন। এই কেন্দ্রে একটি উপনির্বাচনে সিপিএম সমর্থিত অজিত পাণ্ডে জেতেন।

এবারে একেবারে শয্যাশায়ী। জানা গেল, পার্টির বহু সদস্যই নাকি ভোট দিতে যাননি। কলকাতা জেলা কমিটি অজিত পাণ্ডেকে প্রার্থী করার জন্য নামের সুপারিশ

"

(১) যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনের ঘরগুলি কি বিনা ভাড়ায় ব্যবহৃত হয়?

(২) সুভাষ চক্রবর্তীর আমলে যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে যে নৈশ বৈঠক হতো তা কি এখন বন্ধ আছে?

(৩) ৩২ বছরের মধ্যে রাজ্য সরকারের স্বচ্ছ ক্রীড়া নীতি তৈরি হয়নি। এখন কি হবে?

"

রাজ্য কমিটির কাছে পাঠিয়েছিল। আসলে বিভিন্ন কমিটির নেতারা পরবর্তী নীচের স্তরের সভায় ভাষণদান করেই কর্তব্য সমাধা করেন। হাতে কলমে কাজ করে ব্রাঞ্চ সদস্যরা। ব্রাঞ্চে ব্রাঞ্চে নিষ্ক্রিয়, অ্যারোগ্যান্ট সদস্যের সংখ্যাই বেশি। একেবারে তলিয়ে যাচ্ছে পার্টি। সর্বাঙ্গে পারা ঘা দগদগ করছে। কোনও চিকিৎসাই কাজে আসবে না। অপদার্থ অকেজো আরামে ঘরে বসে থাকা নেতারা কেউই স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করবেন না — শুধু মুখে 'ছাড়বো ছাড়বো' করবে। আর সভা-সমিতিতে জ্ঞান বিতরণ করছেন। আপনি আচরি ধর্ম অপরে শিখাও— নীতি মানতে রাজি নন কোনও নেতাই।

কলকাতা পার্টির যা অবস্থা তাতে ২০১০ সালে কলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন নির্বাচনের মুখোমুখি হওয়ার সাংগঠনিক শক্তি ও নেতৃত্ব নেই। পরিবর্তন আনার কথা উঠেছে — কিন্তু বিড়ালের গলায় ঘন্টা কে বাঁধবে? এদিকে মুখ্যমন্ত্রীর রেলমন্ত্রকের কাজ-কর্ম নিয়ে বক্তব্য ঘৃতাহুতির কাজ করেছে। যখন সাধারণ মানুষ মেট্রো রেলের সুবিধা পেতে চান, তখন মন্তব্য করার সময়ে ভাবনা-চিন্তা করা দরকার। বুদ্ধ বাবু বারবার আগুন উস্‌কে দিচ্ছেন। বুদ্ধ বাবুকে কি পলিটব্যুরো শায়েস্তা করতে পারবে?

সিপিএম-এর রাজ্য কমিটি থেকে সমস্ত জেলা-কমিটি আজ বিপর্যস্ত। কলকাতা জেলা কমিটিতে চারটি যুযুধান গোষ্ঠী। দক্ষিণ ২৪ পরগণা, উত্তর ২৪ পরগণা ও হুগলী জেলাগুলির সম্পাদকগণ অসুস্থ-অশক্ত। পার্টি এখন নোঙর ছেঁড়া জলযান। আদর্শহীন পার্টি অবলুপ্তিতে যাবেই। রাশিয়া এবং সমগ্র পূর্ব-ইউরোপ-এ কমিউনিস্ট পার্টি আর নেই। ভারতেও তাই হবেই। রাজ্য সরকারের প্রশাসন বলতে কোনও অস্তিত্ব নেই। মাওবাদীরা রাজ্যের তিনটি জেলায় ঘাঁটি তৈরি করেছে। মশাল এবং অস্ত্র নিয়ে মিছিল করছে। যৌথ বাহিনী ব্যর্থ। মাওবাদীরা তাদের অধিকৃত এলাকায় সাধারণ মানুষদের ছোট ছোট আয়ের ব্যবস্থা করে জনগণের আস্থা এবং ভালবাসা পাচ্ছে। শিকড় গভীরে যাচ্ছে। মনে রাখা দরকার ঠিক এই সময়ে চীনা বাহিনী সমগ্র ভারত সীমান্তে নাথুলা ঘিরে সেনা সমাবেশ ঘটাচ্ছে!

পরিবহন দপ্তরের কয়েকটি ঘটনা মন্ত্রীর গোচরে আনছি, দেখি তিনি কি করেন? পরিবহন দপ্তরে একটি শক্তিশালী চক্র আছে — সেই চক্র দীর্ঘ কয়েক বছর ধরে শক্তিশালী হয়েছে। রণজিৎ কুণ্ডুর পূর্বসূরীগণ তাদের গায়ে হাত দেয়নি — তাদের সঙ্গে নাকি একাত্মতা গড়ে তুলেছিলেন? শোনা যায়, পরিবহন দপ্তরের হাজার হাজার টাকার ব্যাঙ্ক ড্রাফ্‌ট, চেক নাকি ক্যাশ না হয়ে একটি আলমারিতে বন্ধ হয়ে পড়েছিল! এটা কি সত্য? কার গাফিলতিতে সরকারি অর্থের উৎস নাশ করা হল? এরজন্য কে দায়ী? মন্ত্রী কি বলেন?

এখন প্রশ্ন রাখছি কান্তি গাঙ্গুলীর কাছে—

(১) যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনের ঘরগুলি কি বিনা ভাড়ায় ব্যবহৃত হয়?

(২) সুভাষ চক্রবর্তীর আমলে যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে যে নৈশ বৈঠক হতো তা কি এখন বন্ধ আছে?

(৩) ৩২ বছরের মধ্যে রাজ্য সরকারের স্বচ্ছ ক্রীড়া নীতি তৈরি হয়নি। এখন কি হবে?

(৪) ক্রীড়া দপ্তরের টাকার জলের উপর ভাসমান নাটকের পরিকল্পনায় কত লক্ষ টাকা সরকারি অর্থ নাশ করা হয়েছিল?

(৫) যুব কল্যাণের জন্য বিগত দিনে কি কি কাজ হয়েছে তা প্রকাশ্যে জানানো হোক।

(৬) ক্রীড়া দপ্তর কোন কোন ক্লাবকে সাহায্য করেছে তার তালিকা প্রকাশ করা হোক।

এ-সব প্রশ্নের উত্তর মন্ত্রী কান্তি গাঙ্গুলী

(এরপর ৯ পাতায়)

অন্য রকম

কমপিউটার-প্রেমী

নিজস্ব প্রতিনিধি ।। তাঁর সময়ে মোবাইল ছিল না। ছিল না কমপিউটার। ইন্টারনেটও আসেনি তখন। আজ তিনি সময়ের হাত ধরে ১০৮-এ। তাঁর চারপাশে বিজ্ঞান, প্রযুক্তির হরেক উপাদান। সব কিছুর নামও রোসাকুট্টী ভালোভাবে জানেন না। শুধু চোখের সামনে ওসবের ব্যবহার হতে দেখেন তিনি। মনে মনে আনন্দ পান। মাঝে মধ্যে ছুঁয়েও দেখেন। তবে হরেক যন্ত্রের মাঝেও রোসাকুট্টীকে টিভির মতো যন্ত্রটাই বেশি টেনেছিল। মনে মনে ভাবতেন, নাতি-নাতনীরা কী করে এই যন্ত্রে!

কেরলের এডামাকুড়ি গ্রামে একদা ই-লিটারিসির ক্যাম্প হয়। রোসাকুট্টী সেই ক্যাম্প চাক্ষুষ করেন। সেখানেই প্রথম তিনি জানতে পারেন যন্ত্রটির গুরুত্ব। নামটাও জানা হয় সেখানেই। রোসাকুট্টী বুঝতে পারেন ওটা কমপিউটার, ওই কমপিউটারেই চলছে এই জগৎ। ওটা না শিখলে জীবনটাই বৃথা। তখনই মনে মনে ঠিক করেছিলেন তিনিও শিখবেন কমপিউটার। ওই ক্যাম্পে তিনি কমপিউটার শেখেননি ঠিকই। কিন্তু কিছু দিন পরেই হাতে তুলে নিয়েছিলেন মাউস, কী বোর্ড। নিজের উদ্যোগেই আয়ত্ত করতে লাগলেন কমপিউটারের অ-আ-ক-খ। কমপিউটারের সব প্রোগাম তাঁর ধাতস্থ না হলেও, কাজ চলার মতো কমপিউটার বিদ্যা তিনি আয়ত্ত করে ফেলেছেন।

বয়স হলেও যে নবীনগোষ্ঠীর সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলা যায়, তিনি তা উপলব্ধি করেছেন। ১০৮ বছর বয়স তাঁর। তবুও শেখার আগ্রহ বিসর্জন দেননি। এই বয়সেও পাঁচ জনের সঙ্গে কমপিউটার প্র্যাকটিস করেন। শরীর সুস্থ রাখতে নিয়মিত হাঁটেন। ফল-মূল বেশি না খেলেও শরীরের জন্য প্রয়োজনীয় খাদ্য-খাবারও তিনি খান। যাতে সুস্থ থাকা যায়, অনেক কিছু শেখা যায়। হয় তো আরও কমপিউটার প্রোগ্রাম শিখতে চান তিনি।

কমপিউটার নিয়ে ব্যস্ত রোসাকুট্টী।

খোদ অসমের মুখ্যমন্ত্রী ইসলামি মৌলবাদীদের নিয়ে সোচ্চার

নিজস্ব প্রতিনিধি ।। জাতিগোষ্ঠীগত বিদ্রোহ, সন্ত্রাসবাদী, মৌলবাদী ও নকশালবাদীরা অসমে জোট বেঁধে রাজ্যের পরিস্থিতিকে আরও জটিল এবং ঘোরালো করে তুলছে। সম্প্রতি দিল্লীতে অনুষ্ঠিত মুখ্যমন্ত্রীদের সম্মেলনে অসমের এই পরিস্থিতির কথা জানিয়েছেন রাজ্যের কংগ্রেসী মুখ্যমন্ত্রী তরুণ গগৈ নিজেই। ফলে

মনমোহন সিংহ

তরুণ গগৈ

অসমের সাংসদ তথা প্রধানমন্ত্রী ডঃ মনমোহন সিং এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী চিদাম্বরম্ চাপে পড়েছেন। মুখ্যমন্ত্রী গগৈ আরও জানিয়েছেন, এক্ষুনি সন্ত্রাস তথা বিদ্রোহ দমনে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ না করলে পরিস্থিতি খুব শীঘ্রই হাতের বাইরে চলে যাবে।

অসমে দীর্ঘদিন ধরে জাতি-গোষ্ঠীগত বিচ্ছিন্নতাবাদী বিদ্রোহ চলছে। এবার তার সঙ্গে যুক্ত হতে চলেছে নকশালবাদ এবং মৌলবাদ।

শ্রীগগৈ জানিয়েছেন, 'ভারতের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তার ক্ষেত্রে সঙ্কট সৃষ্টিতে ইন্ধন যোগাচ্ছে বাংলাদেশ, নেপাল, ভুটান এবং মায়ানমার। বাংলাদেশ থেকে ভারতে সীমাপার সন্ত্রাস চলছে। বিভিন্ন মৌলবাদী গোষ্ঠীতে ভরে গিয়েছে অসম। ভারতের প্রত্যাশা মতো বাংলাদেশ বিচ্ছিন্নতাবাদী, মৌলবাদী গোষ্ঠীগুলোর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিচ্ছে না। বাংলাদেশ ভারতে সক্রিয় সন্ত্রাসী গোষ্ঠীর নেতাদের ভারতের হাতে তুলে দিচ্ছে না। এমনকী সেদেশের মাটিতে যেসব সন্ত্রাসী শিবির বা প্রশিক্ষণ কেন্দ্র চলছে তাও ধ্বংস করছে না। বাংলাদেশ থেকে অসমে ক্রমাগত অনুপ্রবেশ করে চলেছে হুজির মতো ইসলামী মৌলবাদী সন্ত্রাসী গোষ্ঠীর ক্যাডাররা। তারা অসমে ঢুকে সারা ভারতে ছড়িয়ে পড়ছে। অসম তাদের প্রবেশ দ্বার। এক অশুভ আঁতাত গড়ে উঠেছে — উলফা, এন ডি এফ বি এবং ওইসব ইসলামি মৌলবাদী সন্ত্রাসী গোষ্ঠীগুলোর মধ্যে। তাদের পরিচালিত করছে প্রতিবেশী দেশের গোয়েন্দা সংস্থা। সব মিলিয়ে ভারতের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তার ক্ষেত্রে সংকট তৈরি হচ্ছে।

গগৈ-এর বক্তব্য ওই সব গোষ্ঠী একত্রে মিলে অসমে অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তার সঙ্কট তৈরি করছে বড়সড় হিংসাত্মক ঘটনা ঘটানোর জন্য।' শ্রীগগৈ কেন্দ্র সরকারকে অনুরোধ জানিয়েছেন, বাংলাদেশ সরকারের উপর কূটনৈতিক চাপ বৃদ্ধি করার জন্য। একই সঙ্গে দেশের সীমান্তবর্তী এলাকার যে সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও ধর্মীয় সংস্থা ব্যাপক বিদেশী সাহায্য পাচ্ছে তাও খতিয়ে দেখার সঙ্গে সঙ্গে কড়া নজরদারি করার কথাও বলেছেন। একই সঙ্গে শ্রীগগৈ ভারত-মায়ানমার সীমান্তে কড়া নজরদারির কথাও কেন্দ্রকে জানিয়েছেন। গগৈ-এর কথায় অরুণাচল প্রদেশ, নাগাল্যান্ড, মণিপুর, মিজোরাম প্রদেশের মায়ানমার লাগোয়া সীমান্ত দিয়ে উলফা এবং ডি এইচ ডি (গার্লোসা) গোষ্ঠীর জঙ্গিরা অবাধে যাতায়াত করছে। মায়ানমার থেকে এদেশে অস্ত্রশস্ত্র আমদানি করা হচ্ছে।

আর, নেপালের সঙ্গে ভারতের ভিসা ছাড়াই অবাধ যাতায়াতের সুযোগ নিচ্ছে মাওবাদীরা। তারা শুধু অসম, উত্তরবঙ্গই নয়, সারা ভারতেই মাওবাদ ছড়িয়ে দিতে তৎপরতা চালাচ্ছে। উত্তরবঙ্গ এবং শিলিগুড়ি করিডরকে ব্যবহার করে তারা

অসমে ধৃত ইসলামি জঙ্গি। (ফাইল চিত্র)

নেপালে নিঃশব্দে যাতায়াত করছে। অসমের জনজাতিদেরকেও মাওবাদে দীক্ষিত করতে মাওবাদীরা তৎপর। অতীতেও মাওবাদীরা এরকম চেষ্টা করেছে বলে জানিয়েছেন গগৈ। এক্ষত্রেও গগৈ কেন্দ্রকে সতর্ক করে দিয়েছেন।

উত্তর কাছাড় পার্বত্য জেলায় এ বছরে দীর্ঘদিন যাবৎ সন্ত্রাসবাদ চালিয়ে যাচ্ছে ডি এইচ ডি (জি) জঙ্গি গোষ্ঠী। ওই জেলার সঙ্গে সীমান্ত রয়েছে মণিপুর এবং নাগাল্যান্ডের। যা পার্বত্য এবং জঙ্গলাকীর্ণ। পর্বতের খাঁজে জঙ্গিরা আশ্রয় নিচ্ছে। পার্শ্ববর্তী রাজ্যের সরকার কোনও ব্যবস্থা নিচ্ছে না বলে কেন্দ্রকে জানিয়েছেন তরুণ গগৈ। নাগাল্যাণ্ডে জঙ্গিদের সঙ্গে কেন্দ্রের যুদ্ধ বিরতি চুক্তি রয়েছে। অথচ ওই জঙ্গিরা অসমের উত্তর কাছাড় পার্বত্য জেলা এবং কার্বি আংলং জেলায় দাপিয়ে বেড়াচ্ছে।

ইতিমধ্যে অবশ্য অসম সরকার জাল নোট এবং অনুপ্রবেশ রোধে বিশেষ 'সি আই ডি' সেল খুলেছে বলে গগৈ জানিয়েছেন। তবে বাংলাদেশের সীমান্তরক্ষী বাহিনী বি ডি আর ধৃত বাংলাদেশীদের ফেরৎ নিতে চায় না বলে সমস্যা সৃষ্টি হচ্ছে বলে গগৈ মন্তব্য করেছেন। দেশের নিরাপত্তার পক্ষে বিপজ্জনক মাওবাদ, সন্ত্রাসবাদ, জঙ্গি কার্যকলাপ নিয়ে অসমের মুখ্যমন্ত্রী তরুণ গগৈ দিল্লীতে অনেক কথা বললেও, কলকাতার সংবাদ মাধ্যম তাঁকে কোনও পাত্তাই দেয়নি। তাদের কাছে দেশের নিরাপত্তার থেকে মুখ্যমন্ত্রী সম্মেলনে বুদ্ধ বাবুর অনুপস্থিতি নিয়ে 'গসিপিং' বা রিপোর্টিং নাকি অনেক জরুরী।

গুয়াহাটিতে ১৫ আগস্ট উদ্‌যাপন

সংবাদদাতা ।। বেশ কয়েক বছর বাদে অসমের রাজধানী গুয়াহাটিতে খুবই জাঁকজমকের সঙ্গে গত ১৫ আগস্ট সকালে স্বাধীনতা দিবস পালিত হল। গত কয়েক বছর স্বাধীনতা দিবসে সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠীগুলি কালো দিবস ঘোষণা করার ফলে গুয়াহাটিসহ বিরাট অঞ্চলে দোকান-পাট, বাস, গাড়ি সব কিছুই বন্ধথাকতো। এই বছরও বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছিল। কিন্তু রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের উদ্যোগে এই বছর ১৫ আগস্ট (২০০৯) গুয়াহাটির বিশাল দীঘলীপুখুরী পার্কে সকালে স্বাধীনতা দিবস পালিত হয়। ভারতমাতা পূজন সমিতি গুয়াহাটি মহানগরের পক্ষে 'বন্দে মাতরম্', ভারতমাতা কী জয় ধ্বনির মধ্য দিয়ে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন সমিতির সভাপতি ধীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী।

অনুষ্ঠানে মুখ্য অতিথি হিসাবে অত্যন্ত সময়উপযোগী বক্তব্য রাখেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের কেন্দ্রীয় কার্যকারিণী সদস্য রাম মাধব।

সভার পরে কয়েক হাজার পুরুষ - মহিলা, ছাত্র-ছাত্রীদের একটি মিছিল প্রায় ১ ঘন্টা ব্যাপী শহর পরিক্রমা করে। জাতীয় পতাকা সহ ভারতমাতার বেশে একটি বালিকাকে নিয়ে একটি ট্যাবলো মিছিলের সম্মুখে ছিল। মিছিলে শহরের বিশিষ্ট ব্যক্তিরাও যোগ দিয়েছিলেন। বিজেপির গুয়াহাটির সাংসদ বিজয়া চক্রবর্তী, রাষ্ট্রীয় শৈক্ষিক মহাসংঘের সম্পাদক অজিত বিশ্বাসও মিছিলে উপস্থিত ছিলেন। সভা ও মিছিলের শেষে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন ভারতমাতা পূজন সমিতির সম্পাদক মৃণালজ্যোতি লস্কর।

উলফা-র তোলা আদায়ের বিরুদ্ধে গ্রাম কমিটির দরবার

নিজস্ব প্রতিনিধি।। অসমের শিবসাগর জেলার পুরানো সাপেকাটি এলাকার ২০০টি গ্রামের সাধারণ মানুষ রীতিমতো কমিটি গড়ে অসমের শক্তিশালী সশস্ত্র বিচ্ছিন্নতাবাদী সন্ত্রাসী সংগঠনের উপর চাপ সৃষ্টি করল। সম্ভবত, এই প্রথম উলফা'র কাজকর্মের উপর সাধারণ গ্রামবাসীরা এতটা সাহসের সঙ্গে মোকাবিলায় এগিয়ে এল। প্রসঙ্গত, ওই এলাকার রাস্তার ঠিকাদারের কাছে উলফা ৫০ লক্ষ টাকার ডিমাণ্ড পাঠিয়েছে বলে গ্রামবাসীরা জানতে পারে। তারা তখন তাদের যোগাযোগ সূত্রের মাধ্যমে উলফার কাছে তাদের বার্তা পাঠায়। গ্রামবাসীদের বক্তব্য একেই তাদের এলাকায় রাস্তার অভাবে বেহাল অবস্থা, যেটুকু আছে তাও খানা-খন্দে ভরা। এমতাবস্থায় কন্ট্রাক্টরের কাছ থেকে ব্যাপক পরিমাণে তোলা আদায়ের দাবী করাতে কন্ট্রাক্টরই পালিয়ে যাচ্ছে। রাস্তা আর হচ্ছে না। গ্রাম সমিতির বক্তব্য, দয়া করে উন্নয়ণের অর্থে ভাগ বসাবেন না, তাহলে গ্রামবাসীরা সুখে-শান্তিতে বসবাসই করতে পারবে না। বেহাল সড়ক ও যোগাযোগ ব্যবস্থা গ্রামবাসীদের উন্নতির পথে প্রধান

পরেশ বরুয়া

প্রতিবন্ধক। সরকারের কাছে বারে বারে আবেদন করার পরই সরকার রাস্তা তৈরি বাবদ দশম পরিকল্পনায় ১৪.৪ কোটি টাকা সম্প্রতি বরাদ্দ করেছে। ওখান থেকে ডিব্রুগড় জেলার পিথাগুটি পর্যন্ত ২২ কিমি রাস্তা তৈরি হচ্ছিল। নর্থ ইস্ট কাউন্সিল দ্রুত রাস্তা তৈরির নির্দেশ দিয়েছিল।

এদিকে তোলা আদায়ের নোটিশ পাওয়ার পর ঠিকাদার সংস্থাটি কাজ গুটিয়ে নেয়।

গ্রামবাসীদের কমিটির সম্পাদক বিজয় গগৈ-এর বক্তব্য, 'প্রায় দশ বছরের অবহেলার পর যখন রাস্তা তৈরির ব্যাপারটা এগোল, তখনই উলফাদের কাছ থেকে টাকার দাবী করা হয়েছে। আমরা উলফা নেতাদের গরীব মানুষের স্বার্থে টাকার দাবী প্রত্যাহার করতে অনুরোধ জানিয়েছি।

এদিকে গ্রাম-কমিটির সাধারণ সম্পাদক কেশব গগৈ জানিয়েছেন যে, তারা উলফার তোলা আদায়ের বিরুদ্ধে স্বাক্ষর সংগ্রহ, পোস্টার ও ব্যানার লাগানো শুরু করবেন।

মহারাষ্ট্র বিধানসভা নির্বাচনের মুখে এন সি পি - কংগ্রেস দ্বন্দ্ব চরমে

নিজস্ব প্রতিনিধি ।। মহারাষ্ট্র বিধানসভা নির্বাচনের আগে বিবাদে জড়িয়ে পড়ল মহারাষ্ট্র সরকারের দুই শরিক কংগ্রেস ও এনসিপি। দেশজুড়ে চলা খরা পরিস্থিতির জন্য একতরফাভাবে কেন্দ্রীয় কৃষিমন্ত্রী তথা এন সি পি সুপ্রিমো শরদ পাওয়ারকেই দায়ী করেছে কংগ্রেস। ২৬ আগস্ট এক বৈঠকে শরদ পাওয়ারকে ব্যক্তিগতভাবে আক্রমণ করেন কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য সত্যব্রত চতুর্বেদী। চতুর্বেদীর মন্তব্যকে ঘিরে রাজ্য-রাজনীতিতে প্রবল অসন্তোষ তৈরি হয়েছে। এন সি পি-কে একতরফা ভাবে দায়ী করাটা মেনে নিতে পরছে না এন সি পি শিবির। যদিও কংগ্রেস নেতৃত্ব নিজেদের পিঠ বাঁচাতে চতুর্বেদীর মন্তব্যকে তাঁর ব্যক্তিগত মন্তব্য বলে জানিয়েছেন।

শরদ পাওয়ার

সোনিয়া গান্ধী

তবে মিডিয়ার দৌলতে ইতিমধ্যেই তা মহারাষ্ট্র রাজ্য-রাজনীতিতে বড় ফ্যাক্টর হয়ে উঠেছে। খরার মোকাবিলা, কৃষির অবব্যস্থা পাশাপাশি চিনির মূল্য নিয়ন্ত্রণের ব্যর্থতার জন্যও শরদ পাওয়ারকে দায়ী করেছে কংগ্রেস। শ্রীচতুর্বেদী প্রকাশ্যেই বলেন, কৃষি দপ্তর থেকে বছরের পর বছর ভুল তথ্য দেওয়া হচ্ছে। প্রথমে বলা হচ্ছিল কৃষিতে বিনিয়োগ করে চাষীরা ভালো লাভ পাচ্ছে। কিন্তু হঠাৎই দপ্তর বলছে কৃষকদের হাড়ভাঙা পরিশ্রম ও অর্থ দুই বিফলে গেছে। খরা মোকাবিলায় ব্যর্থতার জন্যও পাওয়ারকে কাঠগড়াতে দাঁড় করিয়েছেন কংগ্রেসের প্রবীণ নেতা সত্যব্রত চুতর্বেদী। ন্যাশনাল আলায়েন্স ফর ফারমার্স অ্যাসোসিয়েশনের আয়োজিত বৈঠকে চতুর্বেদী সরাসরি বলেন, পাওয়ার প্রথমে খরার কথা বলেননি। পরে বলেছেন অনাবৃষ্টির কথা।

চিনির মূল্য নিয়ন্ত্রণে না রাখতে পারার জন্যও পাওয়ারকে দায়ী করেছেন তিনি। তিনি বলেন, পাওয়ার প্রথম থেকে বলে আসছেন চিনি যথেষ্ট মজুত রয়েছে। কিন্তু এখন দাম বাড়ায় বলছেন চিনি মজুত নেই, আমদানী করা হবে। চিনির মূল্য নিয়ন্ত্রণের ব্যর্থতার জন্য এন সি পি দায়ী করায় বিতর্ক আরও জোরালো হয়েছে। উল্লেখ্য, লোকসভা ভোটের আগে চিনির মূল্য বৃদ্ধির পিছনে কংগ্রেস নেতৃত্বকেই দায়ী করেছিল বিজেপি। অতিরিক্ত চিনি মজুত করে কংগ্রেস নির্বাচনী তহবিল বাড়াচ্ছে বলেও বিজেপির সর্বভারতীয় মুখপাত্র প্রকাশ জাবড়েকর আগেই অভিযোগ করেছিলেন।

নির্বাচনের মুখে সত্যব্রত চতুর্বেদীর এই মন্তব্য রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বলেই মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। কংগ্রেসের একাংশ চাইছে এন সি পি-র সঙ্গ ছাড়াই লড়তে। মহারাষ্ট্রের সবকটি আসনেই লড়তে চাইছে কংগ্রেস। মহারাষ্ট্র নির্বাচনে মূল লড়াইয়ে থাকে বিজেপি-শিবসেনা জোট, কংগ্রেস, এনসিপি, ভু-মস্ত্রক পার্টি। বসপা ও সপা-র প্রভাব খুবই কম। কংগ্রেস বিদর্ভ, কোঙ্কনে ভালো ফল করে একাকী লড়াইয়ের পথে হাঁটতে চাইছে। এক্ষেত্রে এনসি পি-র ইমেজ নষ্ট করাও কংগ্রেসের কৌশল বলে মনে করছে কূটনৈতিক মহল।

তবে কংগ্রেস এন সি পি-র এই দ্বন্দ্ব অ্যাডভান্টেজে রাখতে পারে বিজেপি-শিবসেনা জোটকে।

দিল্লীর সংরক্ষিত মসজিদে নমাজ

প্রশাসন ঠুঁটো জগন্নাথ

নিজস্ব সংবাদদাতা ।। পুলিশ প্রশাসনের তোয়াক্কা না করেই, অবাধে চলছে সংরক্ষিত মসজিদে নমাজ পাঠ। দক্ষিণ দিল্লীর বেশির ভাগ সংরক্ষিত মসজিদে মুসলিমরা জোরপূর্বক নামাজ পড়া শুরু করেছে। ভারতীয় প্রত্নতাত্ত্বিক বিভাগের আওতায় সংরক্ষিত বেশ কিছু মসজিদে নমাজ পড়ার অনুমতি না থাকলেও, স্থানীয় মুসলিমরা তার তোয়াক্কা না করেই সেখানে নমাজ পড়ছে। পুলিশ প্রশাসন সবকিছু জেনেও নীরব দর্শক। প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ পুলিশকে এবিষয়ে অবগত করলেও, প্রশাসন কোনও পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি। দিল্লীর ৩০টি পুরনো মসজিদ ১৯১৫ সালেই ভারতীয় প্রত্নতাত্ত্বিক বিভাগের আওতায় আসে। প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ সেগুলিকে নিজেদের সংরক্ষণের অন্তর্ভুক্ত করে। ওই ৩০টি মসজিদের মধ্যে কেবলমাত্র তিনটি মসজিদেই নমাজের অনুমতি আছে। সেগুলির মধ্যে রয়েছে সুনহরী মসজিদ (লাল কেল্লা), নীলী মসজিদ (হৌজখাস) ও পালম মসজিদ (পালম-গাঁও)। অ্যানসেন্ট্ মনুমেন্টস্ আর্কিয়োলজিক্যাল সাইটস্ অ্যান্ড রিনেম অ্যাক্ট (এ এম এ এস আর অ্যাক্ট-১৯৫৮) অনুযায়ী পুরাতত্ব বিভাগের সংরক্ষিত মসজিদে নমাজ পড়া যায় না। কিন্তু কয়েক মাস ধরেই দক্ষিণ দিল্লীর সংরক্ষিত মসজিদে নমাজিরা জোরপূর্বক নামাজ পড়ছে। শুধু তাই নয়, স্থানীয় এলাকায় মুসলিমরা পুরাতত্ত্ব বিভাগের অস্তিত্বকেই অস্বীকার করতে চাইছে। মুসলমানদের বক্তব্য হল যে, অনেক মসজিদ পুরাতত্ত্ব বিভাগের অধীনে আছে। পুরাতত্ব বিভাগ না থাকলে সেগুলোতে নমাজ পড়া যাবে। অর্থাৎ দখল কায়েম হবে।

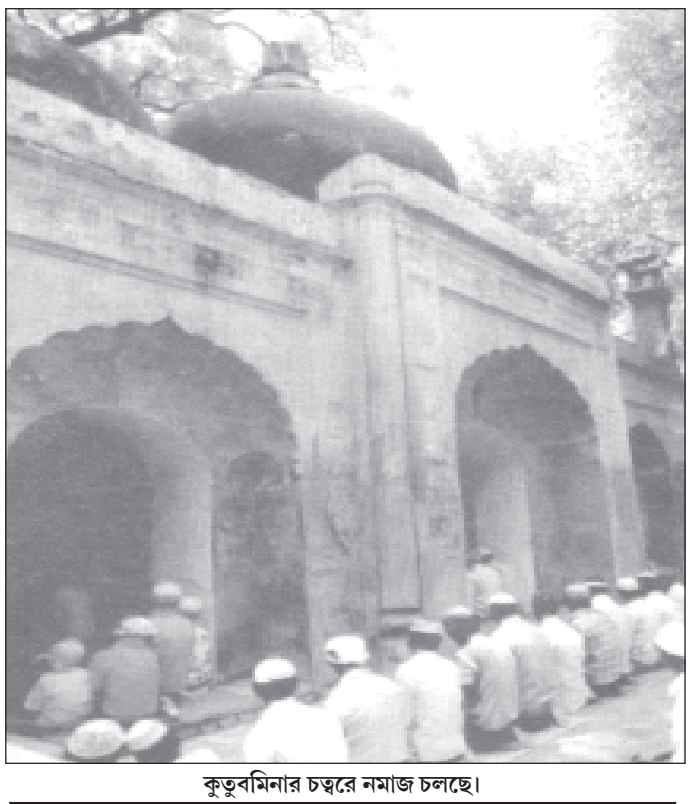

কুতুবমিনার চত্বরে নমাজ চলছে।

জুলাই-আগস্ট মাসে মুসলিমদের উপদ্রব আরও বেড়েছে। দিল্লীর জমালী-কমালী, মান্ডী, বাবলী, চোটী মসজিদসহ আরও বেশ কিছু সংরক্ষিত মসজিদে চলছে নমাজের রমরমা। সংখ্যালঘু ভোটের স্বার্থে সরকারও এবিষয়ে মাথা ঘামাতেনারাজ। মার্চ মাস থেকে মুসলিমরা জমালী-কমালী মসজিদে নমাজ পড়ছে। পুলিশ সব জেনেও নিশ্চুপ। প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের এক আধিকারিকের মতে, পুলিশ যদি শুরু থেকেই এবিষয়ে সতর্ক হতো, তাহলে এই পরিস্থিতি তৈরি হতো না।

মুসলিমদের হাত থেকে বাদ পড়েনি কুতুবমিনার পরিসর। কুতুবমিনার এলাকায় ঢোকার জন্য টিকিট কাটতে হয়। কিন্তু টিকিট তো কোন দূর অস্ত, এখন এখানে অবাধে নমাজ পড়া হচ্ছে। এই কুতুবমিনার পরিসরে দাঁড়িয়েই স্থানীয় মুসলিমরা 'প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ নিপাত যাক' বলে ধ্বনি তুলেছিল। সরকারি বিভাগের অস্তিত্ব নিয়ে প্রশ্ন উঠলেও রাজ্য সরকার কোনও বিশেষ পদক্ষেপ হাতে নেয়নি। ফলত, আজ পরিস্থিতি এতটাই জটিল হয়ে দাঁড়িয়েছে যে, পুলিশও বলছে, যো হোনা সো হোনে দিজিয়ে। জমালী-কমালী মসজিদে নমাজ পড়তে না পেরে তারা মসজিদের বাইরেই শুরু করেছেনমাজ পড়া। এক কথায় পথ অবরোধ করে শুরু হয়েছে ধর্মের নামে সাধারণ মানুষকে হয়রানি করার কু-প্রয়াস। শুধু তাই নয়, এক শ্রেণীর মুসলিম গোষ্ঠী ট্রাকে করে মুসলিমদের জড়ো করে নিয়ে এসে নমাজ পড়া শুরু করছে। সংখ্যা বাড়িয়ে নিজেদের হাতও মজবুত করছে তারা। মুসলিমদের এত তান্ডবের পরেও তাদের শান্ত করার পরিবর্তে, তাদের হয়েই সাফাই গেয়েছেন দিল্লীর ইমাম আহমদ বুখারী। তিনি এক বিবৃতিতে বলেন, যদি পুরনো মসজিদে নমাজের অনুমতি না দেওয়া হয়, তাহলে আমি নিজে নমাজিদের সঙ্গে নিয়ে যাব। ইমামের এই মন্তব্য থেকে প্রশ্ন উঠেছে তাহালে কি দেশের আইনও নমাজিদের কাছে নগণ্য?

রাজ্য সরকারের মদের কারবার

নিজস্ব প্রতিনিধি ।। দেবভূমি দক্ষিণের অন্যতম দেবাঙ্গন কেরলে এখন ছুটছে মদের ফোয়ারা। যোগান দিচ্ছে রাজ্য সরকার। সঠিক অর্থে বলা উচিৎ রাজ্য সরকারের মালিকানাধীন 'বেভকো' বা রাজ্য বেভারেজস্ কর্পোরেশন কেরলে একচেটিয়াভাবে মদের কারবার চালাচ্ছে। সাধারণত আগস্ট মাসের শেষ সপ্তাহে 'ওনাম' উৎসবে রাজ্যবাসীরা দশদিন ধরে 'মদ্যপান'-এর আসর বসায়। সেখানে ঢালাও দ্বিধাহীনচিত্তে ক্লান্তিহীনভাবে মদ খাওয়ার ব্যবস্থা। ওই বিশেষ দশদিনে কেরলে মদ্যপানের রেকর্ড প্রতিবছর আগের বছরকে পার করে দিচ্ছে।

এক বেসরকারি সমীক্ষা অনুসারে ওই দশদিনে প্রায় তিন কোটি জনসংখ্যার কেরলে চাল বিক্রি হয় ১০০ কোটি টাকার। কিন্তু মদ বিক্রি হয় ১৬০ কোটি টাকার। এটা ২০০৮-২০০৯ বছরের হিসেব। তার আগের বছর মদ বিক্রির খতিয়ান হল ১২৬ কোটি টাকার। যদি কেরলের কাউকে জিজ্ঞেস করা হয়, রাজ্যে সর্বাধিক বিক্রীত বস্তু কি? তাহলে এক কথায় একটাই তার উত্তর হবে 'লিকার' অর্থাৎ মদ। মদ বাদ দিয়ে নাকি কেরলে কোনও উৎসব-অনুষ্ঠান সম্পূর্ণ হয় না। সারা রাজ্যেই উৎসব অনুষ্ঠানে অবাধে অবিরাম মদ্যপান চলতে থাকে। এবছর 'ওনাম' উপলক্ষে রাজ্য সরকার দশদিনে মদ বিক্রির লক্ষ্যমাত্রা ধার্য করেছিল ২০০ কোটি টাকা। অন্য এক সমীক্ষা অনুযায়ী, এপ্রিল-জুলাই ০৯-এ কেরল প্রদেশে ভারতে তৈরি বিদেশী মদ এবং বীয়ার বিক্রি হয়েছে- ১, ৭৪৬.৮৪ কোটি টাকার। গত আর্থিক বছরে যা ছিল ১, ৪৮৩.৯৯ কোটি টাকা। একই সময় সীমায় রাজ্য সরকার মদ বিক্রি থেকে রাজস্ব আয় করেছে — ১, ১৬৩ কোটি এবং ১,৩৫৬ কোটি টাকা।

অচ্যুতানন্দন

তবে এসব পরিসংখ্যানের মানে এই নয় যে, প্রত্যেক কেরলবাসীই মদে আসক্ত। কিন্তু এই মদ্যপায়ী সংখ্যালঘুরাই (জনসংখ্যার পনেরো শতাংশ) উৎসবের সময়ে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্র থেকে মদের পিছনে অনেক বেশি টাকা খরচ করে থাকেন। সম্ভবত কেরলেই ভারতে সর্বাধিক পরিমাণে মদ্যপান করা হয়। গত ডিসেম্বরের এক হিসাব অনুযায়ী কেরলে মাসে মাথাপিছু ৮.৩ লিটার মদ খরচ হয়েছে। অথচ সারা ভারতে গড় পরিমাণ হল ৭.৯ লিটার। এনিয়ে রাজ্য সরকার আদৌ মাথা ঘামায় না। কেননা রাজ্য সরকারের ঘরে প্রভূত রাজস্ব জমা পড়ছে মদ বিক্রি থেকে। মদ বিক্রির পরিমাণ ফি-বছর বেড়ে যাওয়ায় বেশ খুশি রাজ্য সরকারের মদ উৎপাদক 'বেভকো' কোম্পানীর উচ্চ পদস্থ অফিসাররা।

'ওনাম' উৎসবের প্রকৃত দিন — থিরুভোনাম্-এর দিন সর্বাধিক মদ বিক্রি হয়। কেরলে প্রতি মাসের প্রথম দিনে অর্থাৎ ১ তারিখে মদ বিক্রি বন্ধ থাকে। মোট মদ বিক্রির ৩০ শতাংশ ওই ওনামের দিনেই বিক্রি হয়ে যায়। এবার 'বেভকো' সরকারকে ১ সেপ্টেম্বর মদ বিক্রির জন্য ছাড় দিতে বলেছে। তবে কেরল হাইকোর্টের নির্দেশকে আবার অগ্রাহ্য করে রাজ্য সরকারের পক্ষে ছাড় দেওয়াটা সহজ হবে না বলেই ওয়াকিবহাল মহল মনে করে। তবে, আশার কথা সমাজবিদরা এই ঘটনায় বেশ চিন্তিত। তাঁদের মতে গ্রীক পুরাণ কথিত 'ব্যাকাস' (দেবতার উদ্দেশে নৃত্য ও মদ্যপান উৎসব) উৎসব কেরলে শিক্ষিত লোকেদেরকে মদ্যপানে উৎসাহিত করে। 'বেভকো'-র ব্যবসা (টার্নওভার) গতবারের আগের আর্থিক বছরে ছিল ৯৪৮ কোটি টাকা। গত আর্থিক বছরে বাৎসরিক টার্নওভার ৪,৬১৭ কোটিতে পৌঁছেছে।

বাংলা গানের বাজারে পাইরেসির দাপট

বিপন্ন শ্রীকান্ত, লোপামুদ্রা, ইন্দ্রনীল

বিকাশ ভট্টাচার্য

রাস্তায় চলাফেরার সময় নিশ্চয়ই আপনাদের চোখে পড়েছে ফুটপাথে চাদর পেতে বা চারপায়া চৌকির উপর ঢেলে বিক্রি হচ্ছে আপনারই প্রিয় নামী-দামী শিল্পীদের সিডি বা ক্যাসেট। মহিষাসুরমর্দিনী বা সর্বকালের হিট পান্নালালের শ্যামাসঙ্গীত থেকে আজকের শুভমিতা বা রূপঙ্কর — সব শিল্পীর জনপ্রিয় গান পাবেন সেই চাদর বা চৌকির ওপর। দাম? অতি সামান্য। কল্পনার বাইরে! মাত্র কুড়ি টাকা। দরাদরি করলে আরও কমে পাবেন। কোয়ালিটির কথা ভাবলে চলবে না। কারণ এই সবই নকল। অর্থাৎ পাইরেটেড।

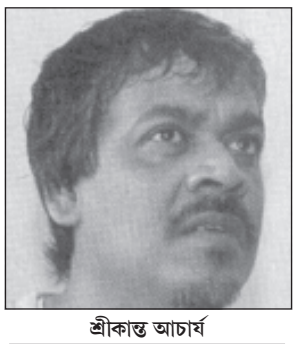

শ্রীকান্ত আচার্য

মান্না দে

ইন্দ্রনীল সেন

লোপামুদ্রা মিত্র

উন্নত প্রযুক্তির হাত ধরে আজ মিউজিক পাইরেসি বা গান চুরি এক বিশাল ইন্ডাস্ট্রিতে পরিণত হয়েছে। দশ বা বিশ বছরের নিরবচ্ছিন্ন প্রয়াস ও পরিশ্রমের ফলে একজন শিল্পী যত গান রেকর্ড করলেন তার পুরোটাই অর্থাৎ সব গানই চুরি হয়ে যাচ্ছে। আগে পাইরেটেড ক্যাসেট অর্থাৎ ডুপ্লিকেট ক্যাসেট হতো বারোটা কি চৌদ্দটা গানের। এখন উন্নত প্রযুক্তির সিডি এসে গেছে। তার হাত ধরে এসেছে এম পি থ্রি। মাত্র কুড়ি-ত্রিশ টাকায় ফুটপাথে বিক্রি হচ্ছে মান্না দে, কিশোর কুমার, লতা মঙ্গেশকর, আশা ভোঁসলে প্রমুখ জনপ্রিয় শিল্পীদের দুশো-তিনশো গানের এম পি থ্রি, কমপ্যাক্ট ডিস্ক। চিন্তা করা যায়? একজন শিল্পীর সঙ্গীত জীবনের উৎকৃষ্ট ফসল চুরি হয়ে যাচ্ছে। শিল্পী বা মিউজিক কোম্পানী কিছুই পেলেন না। লাভের কড়ি (১) পাকিস্তানে তৈরি হয়ে বাংলাদেশ ও নেপাল হয়ে, (২) মালয়েশিয়ায় তৈরি হয়ে বাংলাদেশ হয়ে এবং (৩) বাংলাদেশে তৈরি হয়ে সরাসরি বর্ডার পেরিয়ে পশ্চিমবঙ্গে ঢুকছে। সম্পূর্ণ বেআইনী পথে। আর এইসব বেআইনী সস্তা সিডিতে তোলা হচ্ছে জনপ্রিয় সব গান। নকল হচ্ছে রেকর্ড থেকে ক্যাসেট বা সিডি, ক্যাসেট থেকে সিডি এবং প্রতিষ্ঠিত মিউজিক কোম্পানীর সিডি থেকে সিডি। এইসব নকল করা হয় বাংলার সীমান্তবর্তী গ্রামে — মফঃস্বলে গৃহস্থ বাড়িতে। নকল হয় চালু স্টুডিওতেও। অন্যান্য কাজের ফাঁকে বেআইনী পাচার হয়ে আসা সিডিতে তারা কপি করে দেন অজস্র শিল্পীর গান। তারপর প্যাকেজিং আর মার্কেটিং। একে বলা যায় 'ফিজিক্যাল ফরম্যাট' চুরি।

নন ফিজিক্যাল ফরম্যাট চুরি

ফিজিক্যাল ফরম্যাট চুরি ছাড়াও গুণল কিছু অসৎ ব্যবসায়ী — গান চোরেরা।

পাইরেসির স্বর্গরাজ্য পশ্চিমবঙ্গ

দু-এক বছর আগেও ডুপ্লিকেট মালের অর্থাৎ পাইরেটেড মালের স্বর্গরাজ্য ছিল দিল্লী বা তৎপার্শ্ববর্তী কিছু অঞ্চল। আর এখন বাম-জমানার এই কলকাতাই পাইরেসির প্রধান আস্তানা। ব্ল্যাঙ্ক সিডি বা সিডি (আর) (কমপ্যাক্ট ডিস্ক রেকর্ডেবল) বেআইনী ভাবে মোবাইলের রিংটোন (গান) ডাউনলোড চলছে অবাধে। ওয়েবসাইট থেকে কম্পিউটার এবং উন্নত প্রযুক্তির মোবাইলে ডাউনলোড করে অবাধে আদান-প্রদান চলছে ঘরে ঘরে। গত সপ্তাহে যে নতুন সিডি বাজারে বেরিয়েছে তা কম্পিউটারের মাধ্যমে আপনার কাছে চলে আসছে নিমেষে।

“ এই হতাশ শিল্পীদের বঞ্চনার ইতিহাস আমরা সঙ্গীতপ্রেমী মানুষ যে বুঝি না তা নয়। গান গাওয়াই যাঁদের পেশা, তাঁরা যদি নিজেদের ন্যায্য প্রাপ্যটুকু না পান, তাহলে আমরা সাধারণ মানুষেরা তাদের প্রতি সমবেদনা জানানো ছাড়া আর কিই বা করতে পারি? কিন্তু যাদের হাতে প্রশাসন, যাদের হাতে পুলিশ তারা যদি আইনের শাসন না রাখতে পারেন, বঞ্চিত শিল্পীদের দুঃখ বুঝতে না পারেন, তাহলে? ”

এতে ষাট-সত্তর টাকা দিয়ে আপনাকে কোম্পানী থেকে সিডি কিনতে হচ্ছে না। কোম্পানী পয়সা পেল না। শিল্পী পেল না রয়ালটি। বেআইনীভাবে গান ডাউনলোড করার ফলে ইন্ডিয়ান মিউজিক ইন্ডাস্ট্রির ক্ষতির পরিমাণ বছরে প্রায় ৫০০ কোটি টাকা। ফোনোগ্রাফিক পারফরমেন্স লিমিটেড এই নন ফিজিক্যাল ফরম্যাট চুরি ধরার দায়িত্বে আছে। প্রতি বছরেই শয়ে শয়ে বেআইনী ওয়েবসাইট বন্ধ করে দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু পাইরেসি এখন সর্ববৃহৎ এক ইন্ডাস্ট্রিতে পরিণত হয়েছে। ইন্ডিয়ান মিউজিক ইন্ডাস্ট্রি বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম মিউজিক ইন্ডাস্ট্রি। পরিসংখ্যানে জানা যায় এদের বার্ষিক লেনদেন প্রায় ৬০০ কোটি টাকার, পাইরেসির দাপটে বার্ষিক ক্ষতির পরিমাণও ৬০০ কোটি টাকা। এই মুহূর্তে বিক্রিত প্রতি পাঁচটি সি ডি বা ক্যাসেটের দুটিই জাল বা পাইরেটেড।

আইন ঠুঁটো জগন্নাথ

মিউজিক পাইরেসির পুরো ব্যাপারটি কপিরাইট অ্যাক্ট, ১৯৫৭ অনুযায়ী শাস্তিযোগ্য অপরাধ। তবে এর ৫২ (১) জে ধারা অনুযায়ী যে কোনও মিউজিক প্রোডাক্ট তৈরির দু'বছর পরেই তার রিমেক করা যায়। এক্ষেত্রে ওই ক্যাসেট বা সিডি'র মালিককে একটা নোটিশ পাঠালেই চলে। অনুমতির কোনও প্রয়োজন নেই। ইন্ডিয়ান মিউজিক ইন্ডাস্ট্রির অখিল ভারতীয় সম্পাদক ম্যাবিও ডিসুজা এই প্রসঙ্গে বলেছেন, ''রীতিমতো সংগঠিতভাবেই মিউজিক পাইরেসি চালানো হয় এবং এর পেছনে একাধিক শক্তিশালী 'র‍্যাকেট' কাজ করছে। আর এই শক্তিশালী র‍্যাকেটকে চটাতে চায় না প্রশাসন। ১৯৯৪ সালে তৎকালীন কেন্দ্রীয় মানবসম্পদ উন্নয়ণ মন্ত্রী রাজ্য সরকারগুলিকে পুলিশে বিশেষ বিভাগ খোলার নির্দেশ দেন। যারা শুধু এই বিষয়েই তদন্ত করবে। দুঃখের বিষয় কোনও রাজ্যই সেই নির্দেশ পালন করেনি। 'সারেগামা'র সঞ্জীব গোয়েঙ্কা থেকে 'সাগরিকা'র হীরক দাস — প্রত্যেকেই পাইরেসি ধরার আইন ও তার প্রয়োগ নিয়ে সন্তুষ্ট নন। আইনের ও প্রশাসনের নাকের ডগাতেই তো পাইরেসি চলছে রমরম করে। লালবাজারের নাকের ডগায় চাঁদনী চক আর ডি সি নর্থের নাকের ডগায় শিয়ালদহ তো পাইরেটেড সিডি-র স্বর্গরাজ্য। অথচ কেমন যেন সব দায়সারা ভাব। পরিসংখ্যান বলছে পাইরেসির বিরুদ্ধে পুলিশী অভিযান যে হয় না তা নয়। এই শতাব্দীর প্রথম পাঁচ বছরে মোট ৪৪৩টি পুলিশি অভিযান হয়েছে। ২০০৬-এর প্রথম ছ'মাসেই ১০২টি। কিন্তু তার ফলাফল শূন্য।

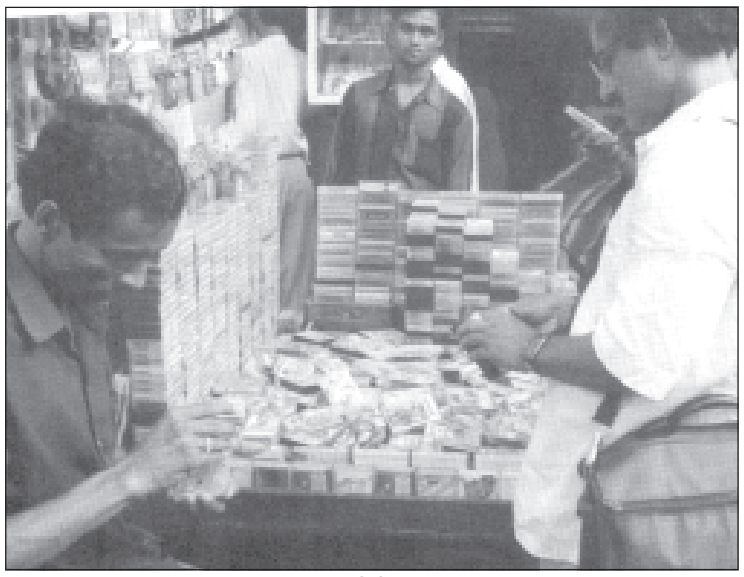

খোলাবাজারে জাল সিডি ক্যাসেটের রমরমা।

পাইরেসি যেন আরও নতুন উদ্যমে চলছে। আই এম আই-এর এক কর্তা জুলিও রিবেইরো বলেছেন, ''১৯৯৬ থেকে পশ্চিমবঙ্গে পাইরেসি সংক্রান্ত কোনও মামলার রায় বেরোয়নি।'' তাহলেই বুঝুন জালিয়াতরা কোন স্বর্গরাজ্যে বাস করছেন। অথচ শুধু এই বাংলাতেই মিউজিক পাইরেসির ধাক্কায় মিউজিক ইন্ডাস্ট্রির বার্ষিক ক্ষতি এখন ১০০ কোটি টাকা ছাড়িয়ে গেছে। তামিলনাড়ুতে 'গুণ্ডা অ্যাক্ট' নামে এক কড়া আইন আছে। তার শক্তিও খুব কঠিন। তাই সেখানে পাইরেসি অনেক কম। পশ্চিমবঙ্গে কি তেমন কোনও আইনের শাসন সম্ভব নয়?

শিল্পীরা কি বলছেন

পাইরেসির কারণে মিউজিক কোম্পানীগুলির অবশ্যই ক্ষতি হচ্ছে। কিন্তু তাদের ক্ষমতা আছে। তারা প্রশাসনের কাছে দরবার করতে পারে। টাকার জোরে কেস লড়তে পারে। কিন্তু অসহায় শিল্পীরা! এই প্রসঙ্গে বরেণ্য সঙ্গীত শিল্পী মান্না দে-র মতামত, ''আমার আর আমার সঙ্গীত জীবনের অনেক বয়স হয়েছে। এতটা পথ এসে আজ মনে হয়, সবটাই ওই, 'চলতি কা নাম গাড়ি'। যেমন চলছে সব তেমনই চলবে। কেউ কিস্যু করতে পারবে না। আমার কথাবার্তা আপনাদের খুবই হতাশাজনক বলে মনে হতে পারে। কিন্তু আমি আমার অভিজ্ঞতা থেকেই এ কথা বলছি। হতাশা যদি থেকে থাকে, সেটিও অভিজ্ঞতা থেকেই জন্ম নিয়েছে। ক্যাসেট বা সিডি নকল হয়ে বাজারে ছড়িয়ে পড়লে কার লাভ হয়? আর যারই হোক, শিল্পীর হয় না। দেশের সরকার রয়েছে। পুলিশ, প্রশাসন রয়েছে। সকলের চোখের সামনে দিয়েই এই চুরি চলছে। বহুদিন ধরেই চলছে। কেউ ভাবছে বলে তো মনে হয় না। সত্যিই মনে হয় না।'' আর এক জনপ্রিয় সঙ্গীত শিল্পী শ্রীকান্ত আচার্য বলেন, ''এ সমস্যা আসলে শুধুই আমাদের। কোনও মিউজিক কোম্পানীই পাইরেসি নিয়ে শেষ পর্যন্ত খুব বেশি মাথা ঘামাতে চায় না। সবচেয়ে দুঃখজনক হল, আমাদের দেশের ক্যাসেট কোম্পানীগুলি শিল্পীর সঙ্গে পুরোপুরি এক তরফা চুক্তি করে। তারা নিজেদের স্বার্থ উদ্ধার করেই খালাস। এরপর একজন গায়কের গান চুরি হলে, জাল হলে, নকল হয়ে সস্তার সিডি, ক্যাসেট হয়ে ফুটপাথে বিক্রি হলে মিউজিক কোম্পানীর কিছুই এসে যায় না। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে বলছি, গান রেকর্ডের নামে আমরা আসলে প্রতিনিয়ত প্রতারিতই হই। আজ বাংলা গানের কোনও অভিভাবক নেই। আবেগের জায়গা থেকেও কেউ পাইরেসি ঠেকাতে চান না। তবু বাংলার গান, বাংলা গানের শিল্পকে বাঁচাতে এগিয়ে আসতে হবে আমাদেরই, শিল্পীদের।''

আর এই ভাবনা নিয়েই ১৯৯০ সালে একদল সঙ্গীত শিল্পী সুচিত্রা মিত্রের নেতৃত্বে দেখা করেন তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুর সঙ্গে। তাঁরা জানিয়েছিলেন জাল সিডি এবং ক্যাসেটের দাপটে তাঁরা বঞ্চিত হচ্ছেন তাঁদের প্রাপ্য রয়ালটি থেকে। জ্যোতিবাবু ব্যবস্থা নিতে নির্দেশ দেন তৎকালীন পুলিশ কমিশনার বিকাশ কলি বসুকে। কিন্তু পরিস্থিতি এই ক'বছরে আরও খারাপ হয়েছে। শ্রীকান্ত আচার্য আর লোপামুদ্রা মিত্র এই বছর তাঁদের গানের এলবাম কোনও কোম্পানীর মাধ্যমে বার করছেন না। তাঁরা তাঁদের গানের সিডি নিজেরাই বার করছেন। বোঝাই যাচ্ছে বঞ্চনার শিকার এইসব শিল্পীদের পিঠ দেওয়ালে ঠেকে গেছে। তাই তাঁরা এমন সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হয়েছেন।

জনসচেতনতা কোথায়

আর এক জনপ্রিয় সঙ্গীত শিল্পী ইন্দ্রনীল সেন মনে করেন, ''গানের ক্রেতারা সচেতন হলে এই সমস্যার সমাধান বহু আগেই হয়ে যেত।'' আরও অনেক শিল্পী তাঁদের অনুষ্ঠানে নকল সিডি বা ক্যাসেট না কেনার জন্য শ্রোতাদের কাছে অনুরোধ জানান। কিন্তু সত্যিই কি আমরা এ বিষয়ে সচেতন। মানুষ সস্তায় যা পাচ্ছে, সহজে হাতের ডগায় যা পাচ্ছে, তা ফেলে কেন দশগুণ দামে সিডি কিনবে? এই প্রজন্মের শিল্পী লোপামুদ্রা মিত্র তাই বলেন, ''আমার দশ বছরের গান একটি এমপিথ্রি-তে ভরে কুড়ি টাকায় বিক্রি করছে দেখলে কেমন হতাশ লাগে।''

তাহলে?

এই হল হতাশ শিল্পীদের বঞ্চনার ইতিহাস। আমরা সঙ্গীতপ্রেমী মানুষ যে বুঝি না, তা নয়। গান গাওয়াই যাঁদের পেশা তাঁরা যদি নিজেদের ন্যায্য প্রাপ্যটুকু না পান, তাহলে আমরা সাধারণ মানুষেরা তাঁদের প্রতি সমবেদনা জানানো ছাড়া আর কী-ই বা করতে পারি? কিন্তু যাঁদের হাতে প্রশাসন, যাদের হাতে পুলিশ তাঁরা যদি আইনের শাসন না রাখতে পারেন, বঞ্চিত শিল্পীদের দুঃখ বুঝতে না পারেন, তাহলে?

তথ্য সূত্র : ইন্ডিয়া টুডে

সঙ্গীত সাধক বিবেকানন্দ

অর্ণব নাগ।। স্বামী বিবেকানন্দ সম্পর্কে সি. রাজাগোপালচারী বলেছিলেন, "তিনি না থাকলে আমরা আমাদের ধর্ম হারাতাম"। শুধু ধর্ম কেন, বোধ হয় হারাতাম সঙ্গীতকেও। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর স্বামীজি সম্পর্কে বলতেন, 'If you want to know India, study Vivekananda'। আর স্বামীজি স্বয়ং বলেছেন, 'I am a voice without a form'। তাঁর মুখনিঃসৃত বাণী দেশের যুব সমাজকে যেমন অনুপ্রাণিত করেছে, তেমনি কণ্ঠ নিঃসৃত সঙ্গীতও যে যুবমানসকে প্রেরণা যোগাবে এতো বলাই বাহুল্য। স্বয়ং রামকৃষ্ণদেব স্বামীজির প্রথম দর্শনেই তাঁর গানে আপ্লুত হয়ে ভাবাবিষ্ট হয়ে পড়েছিলেন। সেদিনের বর্ণনা শ্রীশ্রী ঠাকুরের মুখ থেকে শুনুন। ঠাকুরের ভাষাকে পরিমার্জিত করে লীলাপ্রসঙ্গকার স্বামী সারদানন্দ এই নিয়ে লিখছেন, ".... গান গাহিবার কথা জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম, বাংলাগান তখন সে দুই চারিটি মাত্র শিখিয়াছে, তাহাই গাহিতে বলিলাম। তাহাতে সে ব্রাহ্মসমাজের 'মন চল নিজ-নিকেতনে' গানটি ধরিল এবং ষোল আনা মন-প্রাণ ঢালিয়া ধ্যানস্থ হইয়া যেন উহা গাহিতে লাগিল — শুনিয়া আর সামলাইতে পারিলাম না — ভাবাবিষ্ট হইয়া পড়িলাম।" কথামৃতকার শ্রীম (মহেন্দ্রলাল সরকার) এ প্রসঙ্গে বলছেন, নরেন্দ্র সেদিন দুইখানি গান গেয়েছিলেন। একটি হলো "মন চল নিজ নিকেতনে" এবং আরেকটি হলো 'যাবে কি হে দিন আমার বিফলে চলিয়ে'। যাই হোক না কেন, 'মন চল নিজ নিকেতনে' এই গানটি নরেনের গলায় ঠাকুরের খুব প্রিয় গান হয়ে উঠেছিল পরবর্তীকালে।

একটু পেছনের দিকে ফিরে তাকালে দেখা যাবে, স্বামীজীর এই সঙ্গীতপ্রীতি কোনও অকস্মাৎ ব্যাপার ছিল না। বরঞ্চ বলা যায় পারিবারিক উত্তরাধিকার সূত্রেই সর্বতোমুখী প্রতিভার অধিকারী নরেন্দ্রনাথ দত্ত, উত্তরকালের স্বামী বিবেকানন্দ এই গুণটি পেয়েছিলেন। স্বামীজি গানের গলাটি সম্ভবত পেয়েছিলেন তাঁর মা ভুবনেশ্বরী দেবীর কাছ থেকে। এমনকী ভুবনেশ্বরী দেবীর মা, স্বামীজির দিদিমা রঘুমণি বসুও ভাল গান জানতেন। স্বামীজির বাবা বিশ্বনাথ দত্ত বাড়িতে খ্যাতনামা ওস্তাদ রেখে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত চর্চা করতেন। স্বামীজির ছোট ভাই বিপ্লবী ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত এবিষয়ে একটি চমৎকার তথ্য জানিয়েছেন। তিনি বলেছেন, কিংবদন্তী ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ সিমলের দত্তবাড়িরই শিষ্য।

স্বামী বিবেকানন্দের সঙ্গীত প্রতিভার ব্যাপ্তি আজ কিংবদন্তীর পর্যায়ে পৌঁছলেও, একদিনেই এই উত্তরণ সম্ভব হয়নি। যেটুকু জানা যায়, নরেন দত্ত পিতা বিশ্বনাথের কাছেই শুরু করেন তাঁর প্রথম সঙ্গীত শিক্ষা। বিশেষ করে বিশ্বনাথ দত্ত যখন রায়পুরে ছিলেন, তখন তিনি নরেন্দ্রকে কাছে পেয়ে অনেক প্রকার গান শিখিয়েছিলেন। সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদারের মতে "পিতার নিকট তিনি বাল্যকাল হইতে সঙ্গীত শিক্ষা করিয়াছিলেন এবং গীতবাদ্যেও তাঁহার অধিকার ওইকালে কম ছিল না ('বিবেকানন্দ চরিত', ৩৫)। কাজের কারণে বিশ্বনাথ যখন পশ্চিমাঞ্চলে ছিলেন, তখন তিনি ঠুংরী, গজল, টপ্পা ইত্যাদি শিখেছিলেন এবং অবসর সময়ে পুত্রকেও ওই বিষয়গুলো শিখতে রীতিমতো উৎসাহী করে তুলেছিলেন। ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের মতে স্বামী বিবেকানন্দের সঙ্গীত শিক্ষা হয় বেণী ওস্তাদের কাছে এবং বাঁয়া তবলা ও পাখোয়াজ শিক্ষা হয় কাশীনাথ ঘোষালের কাছে। কাশীনাথ ঘোষাল তখন আদি ব্রাহ্মসমাজে পাখোয়াজ বাজাতেন। তবে স্বামীজীর সঙ্গীতশিল্পী কণ্ঠসঙ্গীত শিক্ষক বেণী ওস্তাদের নাম বিষয়ে মতভেদ আছে। শ্রীযুক্ত গিরীশচন্দ্র ঘোষ ও শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়ের উক্তি উদ্ধৃত করে দিলীপকুমার মুখোপাধ্যায়ের সিদ্ধান্ত — তাঁর প্রকৃত নাম বেণীমাধব অধিকারী। আরও একজন শিক্ষকের নাম এখানে পাওয়া যাচ্ছে। তিনি হলেন আহম্মদ খাঁ। কিন্তু এই মতে বাদ্যসঙ্গীত শিক্ষকের নাম অজ্ঞাত থাকায় তথ্যটির সত্যাসত্য বিচার করাটা একটু মুশকিল।

সঙ্গীতে স্বামীজির আরেকটা অমূল্য কীর্তি — তাঁর সন্ন্যাসপূর্ব জীবনে 'সঙ্গীত কল্পতরু' নাম দিয়ে সঙ্গীতের একটি অসাধারণ সঙ্কলন প্রকাশ। এই বই-এর রেফারেন্স বিভিন্ন জায়গায় পাওয়া যায়। সেই রেফারেন্সগুলিকে এক জায়গায় সাজিয়ে স্বামী গম্ভীরানন্দ অনুমান করেছেন, নরেন্দ্রনাথ দত্ত বা স্বামী বিবেকানন্দই 'সঙ্গীত কল্পতরু'-র ভূমিকাটি লিখেছেন। রেফারেন্সগুলো মোটামুটি এইরকম — স্বামীজীর পুরনো ইংরেজি জীবনীতে বলা হয়েছে, তিনি ভারতীয় সঙ্গীতের বিজ্ঞান ও দর্শন সম্বন্ধে একটি বিস্তারিত ভূমিকা লিখে দিয়েছিলেন একখানি বাংলা গানের পুস্তকের জন্য। ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত জানাচ্ছেন, নরেন্দ্রনাথ বাঁয়া তবলা,, পাখোয়াজ ইত্যাদি যন্ত্রের বাজনা সম্বন্ধে একখানি বই লিখেছিলেন, যেটা বড়তলার বৈষ্ণবচরণ বসাক প্রকাশ করেন এবং ওর একখানি 'কপি' বেলুড় মঠের পুস্তকাগারে আছে। ভূপেন দত্তের কথা মতো, বেলুড় মঠে সংরক্ষিত 'সঙ্গীত কল্পতরু'-র প্রথম ও তৃতীয় সংস্করণে আছে, "১১৮ নং আপার চিৎপুর রোড, কলিকাতা, আর্য পুস্তকালয় হইতে শ্রী চণ্ডীচরণ বসাক কর্তৃক প্রকাশিত।" গ্রন্থকারের নামের স্থলে আছে, "শ্রী নরেন্দ্রনাথ দত্ত, বি এ ও শ্রী বৈষ্ণবচরণ বসাক কর্তৃক সংগৃহীত। স্বামীজির সঙ্গে আরও এক ব্যক্তিকে এখানে সংকলকের ভূমিকায় পাওয়া যাচ্ছে। সেই বৈষ্ণচরণ বসাক এবিষয়ে কি বলছেন তা দেখা যাক। সঙ্গীত কল্পতরু'র প্রারম্ভে 'বিশেষ কথা'য় তিনি লিখছেন, "প্রায় এক বৎসর অতীত হইল ইহার সঙ্কলন কার্য আরম্ভ হইয়াছে। শ্রীযুক্তবাবু নরেন্দ্রনাথ দত্ত, বি এ, মহাশয়ই প্রথমত ইহার অধিকাংশ সংগ্রহ করেন, কিন্তু পরিশেষে তিনি নানা অলঙ্ঘনীয় কারণে অবসর না পাওয়ায় ইহা শেষ করিতে পারেন নাই। তজ্জন্য আমিই ইহার অবশিষ্টাংশ পূরণ করিয়া সাধারণ্যে প্রকাশ করিলাম।" স্বামীজির এক জীবনীকার প্রমথনাথ বসু এই তত্ত্বকে সমর্থন করেছেন। তিনি লিখছেন, "প্রাচ্য সঙ্গীতের সহিত পাশ্চাত্য সঙ্গীতের তুলনা দ্বারা তিনি (স্বামী বিবেকানন্দ) সঙ্গীতবিদ্যা সম্বন্ধে অনেক নতুন তথ্য সংগ্রহ করিয়াছিলেন এবং উক্ত শাস্ত্রের একজন অভিজ্ঞ সমালোচক হইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। এমনকী, কোনও দরিদ্র পুস্তক প্রকাশককে তিনি ভারতীয় সঙ্গীততত্ত্ব সম্বন্ধে একটি প্রকান্ড মুখবন্ধ লিখিয়া দিয়াছিলেন।"

এবার অনুসন্ধান করা যাক, ওই বইটিতে কি ছিল। সঙ্গীত কল্পতরুর প্রথম সংস্করণের প্রারম্ভে ৯০ পৃষ্ঠাব্যাপী ভূমিকায় সুর, তাল, বাদ্যযন্ত্র, বাজনা, বোল, স্বরসাধনা, কনসার্ট ইত্যাদি বহু বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে 'সঙ্গীত ও বাদ্য' এই শিরোনামে। পরিশিষ্টে ১৮ পাতা ধরে 'সাধক ও কবিগণের জীবনী' এই শিরোনামে বিদ্যাপতি চন্ডীদাস রামপ্রসাদ প্রভৃতি অনেকের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া হয়েছে। বাকি 'সংগীত সংগ্রহ' নামক অংশে বহু শ্রেণীর বহু ভাষার সঙ্গীত স্থান পেয়েছে। লক্ষণীয়, ওই বইটিতে জাতীয় সঙ্গীতও মুদ্রিত হয়েছিল। উপরিউক্ত তথ্যগুলি থেকে একটা জিনিস পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে, স্বামীজি শুধুমাত্র একজন সঙ্গীতপ্রেমী বা নিছক একজন সুগায়কই ছিলেন না, ছিলেন তখনকার দিনের একজন সঙ্গীত বিশেষজ্ঞ। বা বলা যায় একজন সঙ্গীত সাধক ছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ। 'সঙ্গীত কল্পতরু'র জনপ্রিয়তা সেকালে এমনই ছিল যে মাত্র ছয় মাসের মধ্যে দুই সংস্করণে দু'হাজার বই বিক্রি হয়ে গিয়েছিল।

গান গাইতে শুরু করলে স্বামীজির আর কোনও দিকে হুঁশ থাকত না। সে বন্ধুকে নিজের ঘরে ডেকে গান শোনানোতেই হোক বা গিরীশ ঘোষের বুদ্ধ দেব চরিত থেকে 'জুড়াইতে চাই, কোথায় জুড়াই' — গানটি নিজের বাড়িতে গেয়ে প্রতিবেশীদের সঙ্গীতমাদকতাতে আচ্ছন্ন করাতেই হোক। রবি ঠাকুরের ব্রাহ্মসঙ্গীত ছিল স্বামীজির বিশেষ প্রিয়। দেশে তো বটেই, বিদেশেও বহু ভক্তকে সেই গানগুলি ভক্তদের শুনিয়েছিলেন স্বামীজী। নিজেও বহু গান পরবর্তী সময়ে রচনা করেছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ।

এই সম্পর্কে দিলীপকুমার মুখোপাধ্যায় বলেছেন, সঙ্গীতের মূল কথা যে রসসৃষ্টি তা তিনি বিলক্ষণ অনুভব করতেন এবং সেই জন্যেই তাঁর গান শ্রোতৃবর্গকে মুগ্ধ করত।" তবে স্বামীজির গানের গলা নিয়ে সেরা কথাটি বলে গেছেন ভগিনী নিবেদিতা। মিস জোসেফিন ম্যাকলাউডকে উদ্ধৃত করে নিবেদিতা 'দি লাইফ অব্ বিবেকানন্দ' বইতে লিখেছেন, "তাঁর কণ্ঠস্বর ছিল ভায়োলিন মেলোর মতন চমৎকার, গম্ভীর হলেও তার মধ্যে প্রবল বিসদৃশ কিছু ছিল না — তা ছিল গভীর স্পন্দনে ভরা, যা সভাস্থল এবং শ্রোতৃবৃন্দের অন্তঃস্থল পূর্ণ করে তুলত।"

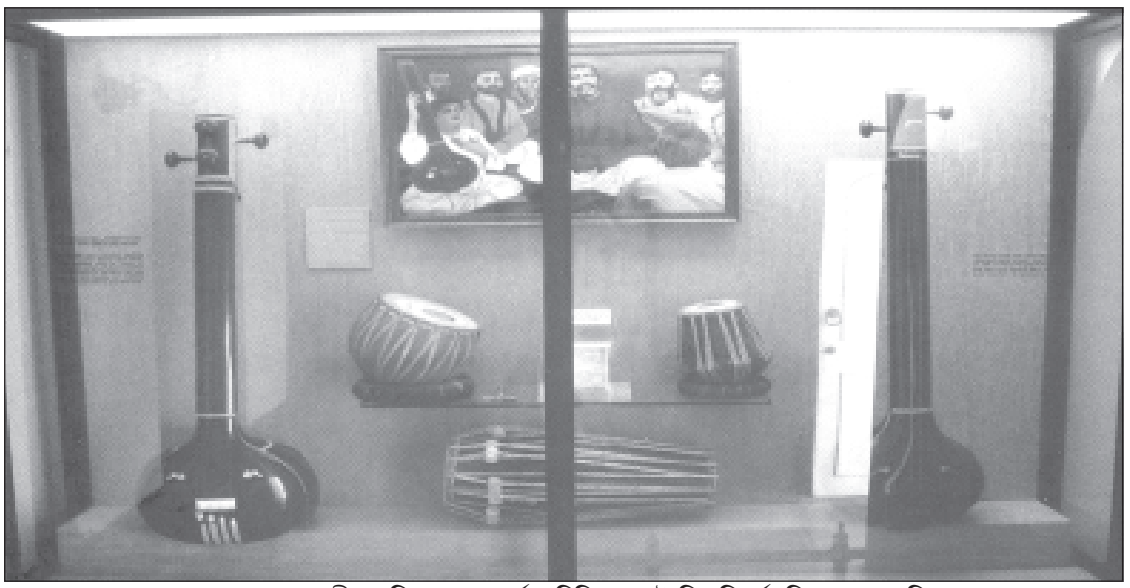

নরেন্দ্রনাথ দত্তের সঙ্গীত প্রতিভার কথা সর্বজনবিদিত। তারই কিছু নিদর্শন সিমলার দত্তবাড়িতে।

রাজনৈতিক দলগুলির ছিন্নমস্তা অবস্থা

(৫ পাতার পর)

দেবেন না। কারণ তিনি জানেন, এর উত্তর দেওয়া হলে বিরাট কেলেঙ্কারী ফাঁস হবে। বামফ্রন্টের অন্য দলগুলির হাল-হকিকৎ পরে লিখবো। তার আগে রাজ্য-কংগ্রেসের অবস্থাটা সংক্ষেপে বলা যাক। কেন্দ্রের কংগ্রেস নেতৃত্ব ঠিক করে ফেলেছে যে, এ-রাজ্যে কংগ্রেস উঠে গেলেও তাঁরা কিছু করবেন না — কারণ তাঁদের উদ্দেশ্য হল — যেন তেন প্রকারেণ কেন্দ্রের মন্ত্রিসভাকে বাঁচিয়ে রাখা — তার জন্য তৃণমূলের যে কোনও শর্ত মেনে নিতে পিছপাও হবে না। এহেন পরিপ্রেক্ষিতে রাজ্য কংগ্রেস একটা স্থানুবৎ সংগঠন। একটা জমায়েত করে চমক দেওয়া যায়, সংগঠন হয় না। কংগ্রেসের নীচের তলার কর্মীরা ক্ষমতার মধুর লোভে তৃণমূলে যাচ্ছে এবং যাবে। প্রসঙ্গত তৃণমূলে সিপিএম সমেত বামফ্রন্টের দলগুলির "করে খাওয়া" কর্মীদের ভিড় দেখা যাবে তৃণমূলে। আর উল্টো-পাল্টা মন্তব্য এবং কৌশলে সিপিএম নেতারা তৃণমূলকেই শক্তিশালী হতে সাহায্য করছেন। সোমেন মিত্র সাহায্য করবেন। কারণ তিনি সাংসদ পদ এবং স্ত্রী-কে বিধায়কপদে ভূষিত করে পুরস্কৃত হয়েছেন। নিত্যপ্রয়োজনীয় এবং খাদ্য-তরিতরকারির দাম আকাশ ছোঁয়া। অপদার্থ রাজ্য সরকার। ঢঙ করে খাদ্য আন্দোলনের ৫০ বছর পূরণ করা হচ্ছে — এই অপদার্থ সরকারের বিরুদ্ধেই খাদ্য আন্দোলন হওয়া দরকার। উত্তরবঙ্গে বন্যারোধের কোনও ব্যবস্থা নেই। খাদ্য দপ্তরের পরীক্ষা থেকে সকল বিষয় নিয়েই ফরওয়ার্ড ব্লকের অভ্যন্তরেই তীব্র কলহ শুরু হয়েছে।

— আর এস পি দলের সংখ্যাগরিষ্ঠ নেতা কর্মীরা বামফ্রন্ট ত্যাগ করতে চান। সিপিআই বামফ্রন্টে থেকেও গোপনে বামফ্রন্ট বিরোধী শক্তিকে মদত দেবে। আদর্শহীনতা-দ্বিচারিতায় পার্টিগুলি নিমগ্ন। আদর্শবান নেতৃত্ব কোথায়? আজকের রাজনীতিতে নন্দলালের দলই বেশি (সূত্র দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের কবিতা — "আমি না বাঁচিলে দেশের কি হইবে হাল — এই নীতি নেতাদের!) জনগণ হতাশ হচ্ছে।

লেখকদের প্রতি

যে কোনওরকম লেখা, সে চিঠিপত্র, সংবাদ বা আলোচনা যাই পাঠান না কেন তা কাগজের একপিঠে পরিষ্কার হাতের লেখায় দু'দিকে যথেষ্ট মার্জিন রেখে না হলে কোন মতেই ছাপার জন্য বিবেচিত হবে না। অমনোনীত লেখা ফেরত দেওয়া হয় না। কোনও লেখারই ফটো কপি গ্রাহ্য হবে না। চিঠিপত্র বিভাগে লেখা পাঠালে খামের ওপর "চিঠিপত্র" কথাটি অবশ্যই লিখবেন। এতে খুব তাড়াতাড়ি চিঠিটি একেবারে চিঠিপত্র বিভাগে গিয়ে পৌঁছায়।

চিঠিপত্র বা সংবাদ সামগ্রী যাই পাঠানো হোক না কেন তাতে প্রেরকের পুরো নাম-ঠিকানা এবং ফোন নাম্বার (যদি থাকে) থাকা দরকার। না থাকলে তা ছাপা হবে না। — স্বঃ সঃ

যশবন্ত সিংহের রাজনীতি ও বাঙালী হিন্দু

শ্রদ্ধেয় যশবন্ত সিংহের সদ্য প্রকাশিত বই Jinnah : India- Partition - Independents –এ জিন্নাপ্রীতি ভারতীয় রাজনৈতিক মহলকে এবং বিশেষত বিজেপিকে এক সত্যের সামনে দাঁড় করিয়ে দিল। হয়তো ঐতিহাসিক তথ্য, শ্রী সিংহের অভিজ্ঞতা এবং বিচারধারা জিন্নাপ্রীতির কারণ হলেও বাঙালী হিন্দুর কাছে জিন্না বা তাঁর মুসলিম লীগ ক্ষমার যোগ্য নয়। মুসলিম লীগের স্বাধীন পাকিস্তানের দাবীতে ১৯৪৬-এর Direct Action লক্ষ লক্ষ বাঙালী হিন্দুর চরম সর্বনাশ ডেকে এনেছিল। মুসলীম লীগের সমর্থক তথা মুসলমানদের পৈশাচিক তান্ডবে হাজার হাজার বাঙালী হিন্দু নর-নারী শিশুকে অকালে মরতে হয়েছিল এবং লক্ষ লক্ষ হিন্দুকে দেশ-মাটির মায়া ত্যাগ করে চলে আসতে হয়েছিল। ইতিহাস বলে কলকাতার রাস্তায় রাস্তায় ঘর-বাড়ি হারানো শরণার্থীর ঢল নেমেছিল। এই রক্তাক্ত, বেদনাময় বাঙালীর ইতিহাসের সাক্ষী আজও বাংলার ঘরে মজুত।

এই কলঙ্কময় ইতিহাস রচনার জন্য জিন্না ও তাঁর মুসলিম লীগ কি দায়ী নয়? লীগের শীর্ষস্থানীয় নেতৃত্ব হিসাবে লক্ষ লক্ষ বাঙালী হিন্দুর চরম সর্বনাশের দায় কি জিন্না সাহেবের উপর বর্তায় না? উপরন্তু জিন্না সাহেবের এই সাম্প্রদায়িক বিভাজনের মনোভাব ভারত-পাকিস্তান ও হিন্দু-মুসলিম চির শত্রুতার সম্পর্ক তৈরি করে গেছে যার শিকার বর্তমান প্রজন্ম।

যশবন্তজীর মতো প্রবীণ সমাজ সচেতক রাজনীতিবিদের কাছ থেকে এই বিচারধারা আমরা আশা করিনি। উপরন্তু হিন্দুত্রাতা শ্রীশ্যামাপ্রসাদের ভাবাদর্শে গঠিত ভারতীয় জনতা পার্টির অত্যন্ত প্রবীণ নেতা হিসাবে পরিচিত শ্রীসিংহের এই জিন্নাপ্রীতি সত্যই আশ্চর্যজনক। বোধ হয়, শ্রীসিংহ লক্ষ লক্ষ হিন্দুর চরম সর্বনাশের সাথে নিজের পান্ডিত্যের ওজনকে গুলিয়ে ফেলেছেন। অবশ্য ইদানীং বিজেপি-র অনেক নেতা-কর্মীরা এই ভুলের শিকার হচ্ছেন।

বিজেপি যশবন্তজীকে বিদায় জানিয়ে বিজেপি-র রাজনৈতিক আদর্শের পুনঃপ্রতিষ্ঠা দিতে পারল যা কিছুদিন যাবৎ বিজেপি হারিয়ে ফেলেছিল, যা তাদের রাজনৈতিক ব্যর্থতার মুখ্য এবং একমাত্র কারণ। হিন্দু-হিতের জন্য বিজেপি-র সৃষ্টি — এই কথাটা বিজেপি ভুলতে বসেছিল। যশবন্তজীকে বিদায় জানিয়ে বিজেপি ভারতের জনগণ ও রাজনৈতিক মহলের সামনে হিন্দুত্ববাদী রাজনৈতিক তত্ত্বই যে তাদের আদর্শ তা প্রমাণ করল।

দুঃখজনক হলেও যশবন্তজীকে বিদায় জানিয়ে বিজেপি সঠিক সিদ্ধান্ত নিয়েছে এবং দেশ ভাগের জন্য লক্ষ লক্ষ অপমানিত হিন্দুর প্রতি সহানুভূতি ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেছে। আশাকরি বাঙালী হিন্দু বিজেপির এই সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানাবে।

মোহন্ত ব্রহ্মানন্দ, রিষড়া, হুগলী।

পরিবহন সমস্যা

১৫ বছরে বেশি পুরনো গাড়ি বাতিল করে কলকাতা হাইকোর্ট যে নির্দেশ দিয়েছে, সুপ্রীম কোর্ট ১০.৮.২০০৯ তারিখে রায়ে তা বহাল রেখেছে। বহাল থাকছে টু-স্ট্রোক অটোর বদলে নতুন ফোর-স্ট্রোক এলপিজি অটো নামানোর আদেশ। এর ফলে নিঃসন্দেহে কলকাতা হাওড়া ও অন্যান্য জায়গায় ভয়ানক পরিবেশ দূষণের হাত থেকে মানুষ বাঁচবে। আবার অন্য দিকে যথেষ্ট সংখ্যক পরিবহন না থাকায় নিত্য যাত্রীদের অবস্থা খুবই শোচনীয়। অধিকাংশ বাস, মিনিবাস ও ট্যাক্সি রাস্তা না নামায় এবং পর্যাপ্ত পরিমাণে সরকারী বাস না থাকায় বিশেষত জেলাগুলিতে অবস্থা খুবই আশঙ্কাজনক, বাদুর ঝোলার মতো জেলাগুলিতে নিত্য যাত্রীদের যে কটি বাস ও মিনিবাস চলছে তার মধ্যেই খুব কষ্ট করে যেতে হচ্ছে। প্রবীণ ও মহিলাদের অবস্থা আরও খারাপ। এর জন্য দায়ী পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্ট সরকার। সময় মতো যদি যথাযথ ব্যবস্থা নিতো, তাহলে মানুষকে এত দুর্ভোগ সহ্য করতে হতো না।

অধ্যাপক আশিস রায়, বি গার্ডেন, হাওড়া।

আমাদের প্রিয় পল্লবদা

আমাদের সবার প্রিয় পল্লবদা (বলুদা) আজ আর আমাদের মধ্যে নেই — ফোনে খবরটা শুনেই, মন অত্যন্ত ব্যথিত এবং ভারাক্রান্ত হয়ে পড়ল কিছুক্ষণ। স্বাভাবিকভাবে যাঁর সঙ্গে সংগঠনের কাজে একসঙ্গে ভ্রমণ, থাকা-খাওয়া, যাতায়াত করেছি।

বিরাট বড় একটি স্তম্ভ ছিলেন পল্লবদা। একদিকে বাড়ির এবং আর এক দিকে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের। আজ সব দিক থেকে বিরাট বড় রকমের ক্ষতি অনুভব হবে সবার মধ্যে।

বাড়িতে যখন থাকতেন অনেক মানুষ বাড়িতে থাকা সত্ত্বেও তিনি একটু আলাদা, বলুদা একজন বিশাল বড় মাপের মানুষ, রাশভারি, মিতভাষী কিন্তু কর্মবীর। বাড়িতে কোনও সিদ্ধান্ত নিতে হলে — বলুদাকে আগে দরকার। বাড়িতে যদি অত্যন্ত কাছের প্রিয় মানুষ বলতে হয়, তাহলে বলুদার ভাইপো মহেশ। কিছু কথা বলার থাকলে, ভাইপো মহেশকে বলে বেরিয়ে পড়তেন।

বলুদা নিজের বিয়ের কথা কোনওদিন ভাবেননি। বিয়ের কথা বললে হাসতেন। মহিলাদের সঙ্গে খুব কম কথা বলতেন। সমস্ত ভাইদের এগিয়ে দেওয়ার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন। নিজের কথা না ভেবে বাকি ভাইদের কথা বেশি ভাবতেন। বাড়ির কাছেই একটি মিলে কাজ করতেন। তখন হাওড়া গ্রামীণ জেলার জেলা প্রচারক হিসাবে রয়েছি। তাঁর মিলে দেখা করতে গেছি। মিলের সকল কর্মচারীদের কাছে তিনি বলুদা নামেই বেশি পরিচিত। সেখানেও সবার আপন ব্যক্তি বলুদা।

হাওড়া গ্রামীণ জেলার জেলা কার্যবাহ হিসাবে সঙ্ঘের কাজের জন্য গ্রামে গ্রামে ঘুরেছেন। স্বয়ংসেবকদের কাছে তখন বলুদা নয়, পল্লবদা নামেই বেশি পরিচিত ছিলেন। পল্লবদার সাথে কাজ করতে করতে মনে হয়েছে, আমার গার্জেন ছিলেন। সঙ্ঘ কাজের কথাই বেশি হতো। গ্রামে যেতে কোথাও দোকানদানি থাকলে, এক আধটা মিষ্টি নয়, পেট ভরে খাওয়াতে ভালোবাসতেন। প্রচারকদের প্রতি ভালোবাসা, একেবারে মায়ের মতো আন্তরিক ভালোবাসা। কম কথা বলতেন, কিন্তু পরিকল্পনা তাঁর বড় রকমের ছিল। কাজে কোনওদিন পিছপা হতেন না। কোনও বড় ব্যক্তিকে সংগঠনের কাজে যুক্ত করতে হবে সোৎসাহে এগিয়ে যেতেন। সঙ্ঘের ২য় বর্ষ শিক্ষাবর্গের ব্যবস্থা প্রমুখ হিসাবে সমস্ত বিভাগকে সক্রিয় করতে হবে, অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে তা পালন করতেন। দেখলে মনে হতো গুরু-গম্ভীর, কিন্তু ভিতরটা ছিল অত্যন্ত কোমল।

একবার কোনও এক ব্যক্তির কারণে রাগ করে বাড়িতে বসে থাকলেন, সঙ্ঘ কাজে কোথাও বেরোচ্ছেন না। সঙেঘর এক প্রবীণ কার্যকর্তাকে নিয়ে বাড়িতে পৌঁছানো মাত্রই দেখছি আমাদেরকে স্বাগত জানানোর জন্য পল্লবদা দাঁড়িয়ে আছেন। সব রাগ বড় অধিকারীদের দেখেই শান্ত হয়ে গেল।

অখিল ভারতীয় প্রতিনিধি সভার বৈঠকে দেখা হতেই সমস্ত মনের কথা হতো। মনে হলো কতদিন পরে দেখা। সাত বছর পর দেখা। হুগলী বিভাগ কার্যবাহের ভার নিয়ে কাজ করতে করতে হঠাৎই চলে যাওয়ায় আমাদের বিশাল মাপের মানুষ পল্লবদাকে (বলুদাকে) হারালাম। ভগবান তো সবাইকে একদিন নেবেনই। কেউই থাকবে না। পল্লবদা চলে গেলেন ঠিকই। কিন্তু তাঁর চলার পথে ভালো কাজ সবার মনে স্মরণীয় হয়ে থাকবে। ভগবানের কাছে তাঁর আত্মার শান্তি কামনা করে লেখা শেষ করলাম।

জয়রাম মন্ডল, হাকিমপাড়া, শিলিগুড়ি, দার্জিলিং।

হিন্দু আর কত কাঁদুনি গাইবে?

হিন্দু আর কত কাঁদুনি গাইবে? আর কত অভিযোগ-অনুযোগ করবে? সরকারের 'কর্ণকুহরে' ওসব অভিযোগ প্রবেশ করবে না। কারণ, সরকার দায়িত্ব নিয়েছে ইসলামের সম্প্রসারণ আর রক্ষণা-বেক্ষণের। তাই সরকার মুর্শিদাবাদে আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি শাখা খুলতে চলেছে। ব্যয় মাত্র ৫০ কোটি টাকা। আমরা জানি আলিগড়ের খ্যাতি রয়েছে মজবুত তালা আর ভাল সন্ত্রাসী তৈরির জন্য। এবার থেকে মুর্শিদাবাদে ভাল তালা তৈরি হবে কি না জানা নেই। তবে উপযুক্ত প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সন্ত্রাসী তৈরি হবে, যারা পূর্ব-ভারতে সন্ত্রাসবাদী কাজকর্ম চালাবে। পশ্চিমবাংলায় স্বীকৃত মাদ্রাসার সংখ্যা ৫০০। এগুলি সরকারি অনুদান পায়। পশ্চিমবাংলায় স্বীকৃতিহীন বা খারিজি মাদ্রাসার সংখ্যা মোটামুটিভাবে ২৫০০। এগুলিকে স্বীকৃতি দেওয়ার ব্যবস্থা হচ্ছে, যাতে এগুলিও সরকারি অনুদানের স্বীকৃতি পায়। অথচ সংস্কৃত শিক্ষার টোলগুলি সরকারি অনুদানের অভাবে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। তা যাক, তাতে কোনও ক্ষতি নেই। কোনও মুসলমান ছাত্র যদি ডাক্তারী, ইঞ্জিনিয়ারিং, ম্যানেজমেন্ট বা অন্য কোনও উচ্চ শিক্ষার সুযোগ পায়, তাহলে তার পড়াশোনার সব খরচ যোগাবে সরকার, এমনকী তার হোস্টেলে থাকা, খাওয়ার খরচ পর্যন্ত। মুসলমান ছাত্রটির পারিবারিক ইনকাম্ যদি মাসিক ২০ হাজার টাকারও বেশি হয় তাহলেও। অথচ প্রায় প্রতিবছরই সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয় জয়েন্ট - এন্ট্রান্স-এ পাশ করেও অনেক হিন্দু ছাত্র ডাক্তারী বা ইঞ্জিনীয়ারিং পড়তে পারছে না শুধুমাত্র দারিদ্র্যের কারণে। এই সমস্ত ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য সরকারের কোনও মাথা ব্যথা নেই। 'হজযাত্রা' মুসলমানদের একটি পবিত্র তীর্থযাত্রা। হজযাত্রার জন্য আমাদের সরকার প্রতি বছর কয়েক'শো কোটি টাকা খরচ করে থাকে। ২০০৭-এ এই হজ যাত্রীদের জন্য ৩০০ কেটি টাকা খরচ করে সরকার। অথচ গঙ্গাসাগর, তারকেশ্বর, সবরীমালাই, কুম্ভমেলা প্রভৃতি স্থানে হিন্দু তীর্থযাত্রীদের কাছ থেকে সরকার কর আদায় করে। আবার ঘুটিয়ারি শরিফ, ফুরফুরা শরিফ বা আজমীড় শরিফে করের কোনও ব্যাপারই নেই। প্রতি বছর বাংলাদেশ থেকে মুসলমান তীর্থযাত্রীদের নিয়ে একটি স্পেশাল ট্রেন আসে মেদিনীপুরে 'উরষ' উৎসবে যোগ দিতে। সেখানে কোনও করের ব্যাপার নেই।

ধর্মনিরপেক্ষতার ধবজাধারী আমাদের দেশের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দেরও একই অবস্থা। পশ্চিমবাংলার এক জননেত্রী তো মুসলমনদের জন্য জান লড়িয়ে দিচ্ছেন। তিনি তিলজলা লেনের বাসিন্দা রিজওয়ানুর রহমানের অস্বাভাবিক মৃত্যুর ঘটনায় ব্যথিত চিত্তে শোক মিছিল করলেন, অথচ শৈলেন্দ্র প্রসাদকে মুসলিম মেয়ে বিয়ে করার অপরাধে মুর্শিদাবাদে শ্বশুর বাড়িতে জবাই করে লাশটা পাটক্ষেতে পুঁতে দেওয়া হলে, বা অর্ক বন্দ্যোপাধ্যায়কে বারাসতে একই অপরাধে জীবন্ত পুড়িয়ে মারার চেষ্টা হলে তিনি মৌনব্রত অবলম্বন করে থাকেন। বাংলাদেশী লেখিকা তসলিমা নাসরিনকে কলকাতা থেকে বহিষ্কারের উদ্দেশ্যে কলকাতায় যে তান্ডব সৃষ্টি হয়েছিল তার প্রতিক্রিয়াতেওই জননেত্রী বললেন, "তসলিমা থাকলে যদি অশান্তি হয়, তাহলে তার চলে যাওয়াই ভাল"। বামফ্রন্ট চেয়ারম্যান বিমান বসুর বক্তব্যের একেবারে True copy । শুধুমাত্র এই নয়, গত বছর সিঙ্গুরের ধর্ণামঞ্চে বসে মুসলিম কায়দায় যে ভাবে মাথা ঢেকে নমাজ আদায় করলেন তাতে সৈয়দ মহম্মদ নুরুর বরকতির রহমান অবশ্যই 'বহোত খুশ' হয়েছেন। শোনা যাচ্ছে, তিনি নাকি রেলে চাকরির ৩০ শতাংশ মুসলমানদের জন্য সংরক্ষণের নির্দেশ দিয়েছেন। উদ্দেশ্য কি শুধুই

জনমত

মুসলিম ভোট না আরও অন্য কিছু? প্রসঙ্গ ক্রমে বলা যেতে পারে পশ্চিমবঙ্গে মুসলমানদের সংখ্যা ২ কোটিরও বেশি বা ২৫ শতাংশর বেশি। তাহলে পশ্চিমবঙ্গে সব চাকরি মুসলমানদের জন্য প্রাথমিকভাগে সংরক্ষণের দাবী উঠতেই পারে।

দেশের প্রায় সব রাজনৈতিক দলগুলিরই এক 'রা'। এদের উদ্দেশ্য মুসলিম ভোট কব্জা করে সরকারি ক্ষমতায় আসা। তাই এরা কোনওভাবেই মুসলমানদের বিরাগভাজন হতে চায় না। এইসব রাজনৈতিক নেতাদের লক্ষ্য কি শুধুমাত্র মুসলিম ভোট? না তৎসহ আরবীয় নোট! সঠিক জানা নেই। তবে এদের মুসলিম প্রীতি দেখলে সন্দেহটা অমূলক মনে হয় না।

এবার বুদ্ধিজীবী প্রসঙ্গ। পশ্চিমবঙ্গে কবি, সাহিত্যিক, চিত্র পরিচালক, চিত্র তারকা, সঙ্গীত শিল্পী, চিত্র শিল্পী অনেক রয়েছেন। এঁদের অনেকেই রিজওয়ানুর রহমানের অস্বাভাবিক মৃত্যুতে শোকাহত হয়ে শোক মিছিলে অংশগ্রহণ করেছিলেন, নন্দীগ্রামে পুলিশের গণহত্যার প্রতিবাদে গণমিছিল করেছিলেন। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্ট সরকার যখন ন্যক্কারজনকভাবে তসলিমা নাসরিনকে কলকাতা থেকে বহিষ্কার করল, তখন ওইসব তথাকথিত বুদ্ধিজীবীরা মৌনীবাবা বনে গিয়েছিলেন। ব্যতিক্রমীরা অবশ্যই ছিলেন। তাঁরা নমস্য। গত ১০ জুলাই মুর্শিদাবাদের বেলডাঙ্গা মহকুমার নওদা থানা এলাকায় ধর্মান্ধ সশস্ত্র মুসলিমরা এক তরফাভাবে হিন্দুদের ওপর আক্রমণ করে। গত জুন মাসেও অনুরূপ ঘটনা ঘটেছিল দক্ষিণ ২৪ পরগণার জয়নগর থানার গোরের হাটে।

সংবাদপত্র অবশ্য ভেতরের পৃষ্ঠায় 'দুই গোষ্ঠীতে সংঘর্ষ' নামে ছোট্ট করে খবর ছেপেছিল, যাতে আসল খবর কিছুই প্রকাশ পায়নি। আরবীয় নোটের একটা মোটা অংশ অবশ্যই এদের জন্য ব্যয়িত হয়। তাই মুসলমানদের বিরুদ্ধে কোনও সংবাদ এরা প্রকাশ করে না।

অত্যন্ত আশ্চর্যজনক যে যাদের এদেশে থাকার কোনও অধিকারই নেই তাদের জন্য আমাদের দেশের সংবাদ মাধ্যম, বুদ্ধিজীবী এবং রাজনীতিকরা এত দরদি কেন? বছর দুয়েক আগে দেশের প্রধানমন্ত্রী বলেছিলেন, "দেশের সম্পদের ওপর সংখ্যালঘুদেরই প্রথম অধিকার"। তৎকালীন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অর্জুন সিং-ও বলেছিলেন, মুম্বই-এ সাতটি স্টেশনে ট্রেনে যে নাশকতামূলক কাজকর্ম চালানো হয়েছিল তাতে মুসলমানরা আদপেই জড়িত নয়। অথচ পুলিশ তদন্তে প্রকাশ পেল ওটা মুসলমান সন্ত্রাসীদেরই কাজ। মুসলমানদের কুকর্ম আড়াল করার এত চেষ্টা কেন? তাদের সৎ নাগরিক প্রতিপন্ন করার পেছনে কোন রহস্য কাজ করছে? এই পরিস্থিতিতে হিন্দুদের শুধুমাত্র কাঁদুনি গাইলে আর অভিযোগ-অনুযোগ করলে কোনও লাভ হবে না। 'সবই ঠাকুরের ইচ্ছে' বলে নিশ্চেষ্ট হয়ে থাকলেও চলবে না। সরকারের মুখাপেক্ষী হয়ে না থেকে নিজেদেরই সক্রিয় হতে হবে, প্রতিরোধ করতে হবে। প্রয়োজনে প্রতিশোধ নিতে হবে। মূলমন্ত্র হবে ইঁট কা বদলা পথর, দাঁত কা বদলা দাঁত। ১৯৪৬ সালের ডাইরেক্ট অ্যাকশনের পুনরাবৃত্তি ঘটানোর প্রস্তুতি চলছে। সেটা আর ঘটানো যাবে না। সেটা সম্ঝে দিতে হবে। মার খেলে বাঘও পিছু হটে, আর এরা তো কতগুলো ক্রিমিনাল।

স্বস্তিকার দাম
প্রতি সংখ্যা - ৪.০০ টাকা
বার্ষিক গ্রাহক মূল্য
সডাক্ - ২০০.০০ টাকা

পরম্পরা

অম্বর দুর্গের শিলাদেবী কি প্রতাপাদিত্যের যশোরেশ্বরী ?

সোমনাথ নন্দী

যশোরাধিপতি প্রতাপাদিত্য। বাংলার স্বাধীন বারো ভুঁইয়াদের অন্যতম স্বাধীন রাজা। মুঘল অধীনতাকে তিনি স্পর্ধা জানিয়েছিলেন, অবজ্ঞার চোখে দেখেছিলেন। দীর্ঘ সময় প্রবল পরাক্রমে যুদ্ধ ও চালিয়ে গেছেন। সময়ে সময়ে মুঘল বাহিনীকে পিছু হটতে বাধ্য করেছেন। সেকি নিজ সুশিক্ষিত সৈন্যদলের শক্তিতে, না অন্য কোনও বিশেষ শক্তির আধারে ! যে শক্তির সামনে বাঘা বাঘা মুঘল সেনাপতিরা বারবার পর্যুদস্ত হয়েছে। ছোট এক সামন্ত রাজার সামান্য সৈন্যদলের কাছে। ইতিহাসের তথ্য অনুযায়ী প্রতাপাদিত্যের কাছে মুঘল বাহিনী সাত-সাতবার পরাস্ত হয়েছে। এই বিজয়ই প্রতাপকে যুগিয়েছে স্পর্ধা জানানোর সাহস ও সংকল্প।

প্রতাপাদিত্যের বিজয়কাহিনীর প্রেক্ষাপটে যাবার আগে জানা দরকার কেমন ছিলেন এই মানুষটি। তিনি একদিকে ছিলেন বীর, সাহসী, ধুরন্ধর কূটনীতিবিদ্, স্বাধীন সত্তার অধিকারী। অন্যদিকে তাঁর চরিত্রে ফুটে উঠেছিল এক কালিমালিপ্ত দিক। তিনি ছিলেন কুচক্রী। প্রবল স্বার্থান্বেষী ও কপটাচারী। বিষয়টি তাঁর জীবনীকার রামরাম বসুর 'রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র' ও প্রতাপ ঘোষের 'বঙ্গাধিপ পরাজয়' গ্রন্থে বিশেষভাবে পরিলক্ষিত। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ তাঁর প্রতাপ চরিত্রনির্ভর উপন্যাস 'বৌ ঠাকুরাণীর হাট' গ্রন্থে প্রতাপাদিত্যের এই অন্ধকারময় দিকটি অঙ্কিত করতে দ্বিধা করেননি। প্রসঙ্গত তিনি বলেছেন — 'স্বদেশী উদ্দীপনার আবেগে প্রতাপাদিত্যকে এক সময়ে বাংলাদেশের আদর্শ বীর চরিত্ররূপে খাড়া করবার চেষ্টা চলেছিল। আমি সে সময়ে তাঁর সম্বন্ধে ইতিহাস থেকে যা কিছু তথ্য সংগ্রহ করেছিলাম তার থেকে প্রমাণ পেয়েছি তিনি অন্যায়কারী, অত্যাচারী, নিষ্ঠুর লোক'।

প্রতাপাদিত্য যে মধ্যযুগীয় ভুঁইফোড় জমিদার মানসিকতার মানুষ ছিলেন, এ তো ঐতিহাসিক সত্য। সেটাই ফুটে ওঠে ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদারের বক্তব্যে — বারো ভুঁইয়ার প্রায় সকলেই এক যুগসন্ধির অরাজকতার সুযোগ নিয়ে বাংলার নানা স্থানে স্বীয় আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। এঁরা কোনও প্রাচীন বংশের প্রতিনিধি নয়, নিজের সম্পত্তি রক্ষার জন্যই যুদ্ধ করেছিলেন। প্রতাপাদিত্য অতুলনীয় বীর ও দেশপ্রেমিক বলে খ্যাতিলাভ করেছিলেন। কিন্তু তিনি কোনও যুদ্ধেই বীরত্ব দেখাতে পারেননি এবং বাঙালী জমিদারদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে মুঘল সুবাদারকে সাহায্য করবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন।

বাস্তবে প্রতাপাদিত্য যা যা করেছিলেন নিজ সংকীর্ণ স্বার্থসিদ্ধির জন্য। তিনি স্বাধীন হয়েও কিছু দিনের জন্য বাদশাহ আকবরকে খুশী করলেন পুরানো রাজস্ব মিটিয়ে। পরিবর্তে আদায় করলেন মহারাজা খেতাব। তারপর আবার স্বাধীন রাজার মতো আচরণ। কাকা বসন্ত রায় তাঁকে জমিদারী তথা রাজ্যবিস্তারে নানাভাবে সাহায্য করেছিলেন। সেই নিঃস্বার্থ সাহায্যকারীকে তিনি পথের কাঁটা ভেবে একদিন সরিয়ে দিলেন পৃথিবী থেকে। সেই থেকে প্রতাপ নিজ আত্মীয়-স্বজন ও প্রজাদের চোখে নির্ভরতার কেন্দ্রবিন্দু রইলেন না। সন্দেহের পাত্র হয়ে উঠলেন। তাঁর উদ্ধত ও দাম্ভিক ভাব তাঁর পতনের কারণ হল।

বাংলায় পাঠান রাজত্বের শেষ সুলতান ছিলেন দাউদ খান কারনানী। ১৫৭৬-এ মুঘলদের সঙ্গে যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত হন তিনি। বাংলা যায় মুঘল অধিকারে। শাসনকর্তা হন মুঘল সুবাদার অত্যাচারী অকর্মণ্য শের খাঁ। এই সুযোগে বাংলার বারো সামন্তরাজা বা জমিদার নিজেদের স্বাধীন ঘোষণা করে মুঘল অধীনতাকে অস্বীকার করেন।

প্রতাপের জমিদারী ছিল সুন্দরবন অঞ্চলে পিতৃসূত্রে পাওয়া। অঞ্চলের দুর্ভেদ্যতা ও বিষাক্ত পোকামাকড়ের উৎপাত অজেয় মুঘলবাহিনীকে প্রতাপাদিত্যের সুশিক্ষিত সৈন্যদল পিছু হটাতে সাহায্য করে। সাত বছর ধরে চলে এই যুদ্ধ। মুঘল সম্রাট আকবরের সময় থেকে।

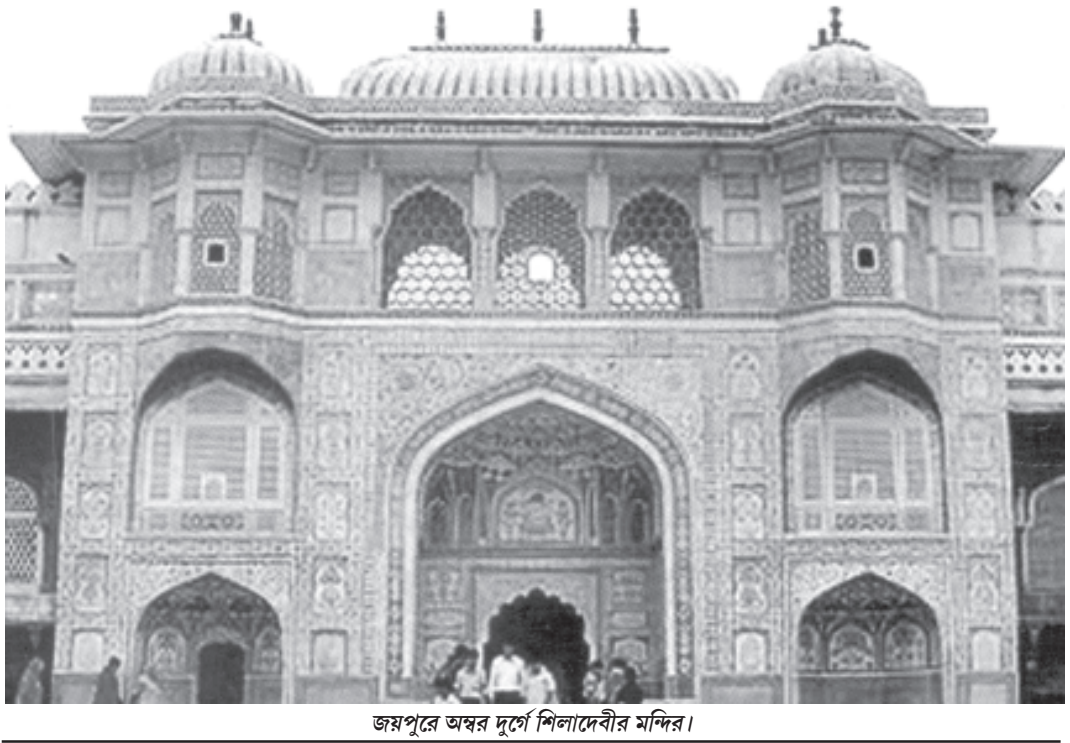

১৬০৫ সালে আকবর পুত্র জাহাঙ্গীর দিল্লীর মসনদে আসীন হবার পর অম্বরাধিপতি মানসিংহকে পাঠান প্রতাপকে দমন করতে। চতুর মানসিংহ প্রথমে অনুসন্ধান করেন প্রতাপের অজেয় থাকার কারণ। গুপ্তচর সূত্রে জানতে পারেন মানসিংহ, প্রতাপ কুলদেবী যশোরেশ্বরী কালীর কৃপাধন্য। যতদিন যশোরেশ্বরী রাজধানী যশোরে থাকবেন, ততদিন অজেয় থেকে যাবেন মহারাজ প্রতাপাদিত্য।

মানসিংহ যুদ্ধাভিযানের আগে বেশ কিছুদিন দেবীর আরাধনা করলেন বিজয় প্রাপ্তির জন্য। এ ব্যাপারে তাঁকে যথোচিত উপদেশ দেন কাশী নিবাসী শক্তিসাধক কামদেব ব্রহ্মচারী। পুজো সমাপ্ত হলে মানসিংহ স্বপ্নে দেবীর দর্শন পান। দেবী তাঁকে বলেন — প্রতাপাদিত্য আমাকে চলে যেতে বলেছে। আমি তাঁর রাজ্যে থাকলে তাঁকে পরাস্ত করা অসম্ভব। বর্তমানে আমি আছি সমুদ্র খাঁড়ির জলের তলায়। তুমি আমায় জল থেকে তুলে পূজা করলে বিজয় হবে তোমার।

দেবীর প্রতাপাদিত্যকে ত্যাগ করা ছিল অছিলা মাত্র। প্রতাপের অত্যাচার, প্রজা-পীড়ন ও কপটাচারে দেবীও ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছিলেন। তাঁকে ত্যাগ করার কথাই তিনি ভেবেছিলেন। সুযোগ আসে একদিন। প্রতাপ সেদিন দেবীর পুজোয়। হঠাৎ তাঁর সামনে আবির্ভূত হলেন এক অনিন্দ্যসুন্দরী বালিকা। বালিকার রূপের ছটায় মনসংযমে ব্যাঘাত ঘটতে লাগল তাঁর। রাজা ক্রুদ্ধ স্বরে বালিকাকে স্থান ত্যাগের নির্দেশ দিলেন। বালিকা আদেশ অস্বীকার করে মিটিমিটি হাসতে লাগলেন। রাজা এবার চেঁচিয়ে উঠে বললেন, দূর হও তুমি। সহসা বালিকা মূর্তি রূপান্তরিত হলেন তাঁর ইষ্টদেবী যশোরেশ্বরী কালীমূর্তিতে। বললেন, প্রতাপ তুমি যখন চলে যেতে বলেছো চলেই যাচ্ছি। পরদিন দেবী বিগ্রহ সত্যই অদৃশ্য হলেন। এতো গেল এক জনশ্রুতি। অন্য জনশ্রুতি মানসিংহ বিগ্রহকে চুরি করিয়েছিলেন প্রতাপের শক্তি খর্ব করার জন্য। এরপরের ইতিহাস সকলেরই জানা। প্রতাপাদিত্য শোচনীয়ভাবে পরাজিত হন মানসিংহের কাছে। বন্দি অবস্থায় দিল্লী যাবার পথে মৃত্যুবরণ করেন তিনি।

জয়পুরে অম্বর দুর্গে শিলাদেবীর মন্দির।

দেবীর শক্তির পরিচয় পেয়ে মানসিংহ উল্লসিত। বিগ্রহকে পরম ভক্তি সহকারে নিয়ে এলেন নিজ নিবাস রাজপুতানায় (বর্তমান রাজস্থান-এর অম্বর দুর্গে) ১৬০৬ সালে সম্ভবত। সেখানে নির্মাণ করলেন শ্বেত মার্বেল পাথরের সুদৃশ্য মন্দির। সারা অঙ্গে তার নয়ননন্দন সূক্ষ্ম ফুলকারির নক্সা। দেবী অম্বর রাজাদের কাছে সাধারণ রাজপুতদের কাছে পরিচিত হলেন শিলাদেবী রূপে। দেবী বিগ্রহ যেহেতু কালো কষ্টিপাথরের, তাই নাম হয় শিলাদেবী। হারিয়ে যান যশোরেশ্বরী শিলাদেবীর অন্তরালে। শিলাদেবী পরবর্তী অধ্যায়ে হয়ে ওঠেন কাছওয়া রাজপুত অম্বর রাজাদের উপাস্য দেবী।

দেবীর আগমনের পর অম্বর তথা জয়পুর রাজাদের প্রভাব ও প্রতিপত্তি সারা দেশে ব্যপ্ত হয়। তখন থেকেই রাজপরিবারের বিশ্বাস — এসবই "দেবীজী কা কৃপাসে"। তাই রাজ পরিবারের বর্তমান প্রজন্মের মানুষরাও দিন শুরু করেন দেবীর পুজো করে।

অম্বর রাজাদের রাজধানী পরবর্তীকালে গোলাপী শহর জয়পুরে স্থানান্তরিত হলেও, বর্তমানে রাজ পরিবারের লোকেরা প্রায়ই আসেন মায়ের দর্শনে ও আশীর্বাদ নিতে। জয়পুরের বর্তমান নরেশ ব্রিগেডিয়ার ভবানী সিংহ এখনও প্রতিদিন দেবীর দর্শনে আসেন তাঁর আশীর্বাদ নিতে।

শিলাদেবী যে কালীবিগ্রহ তাঁর অন্য প্রমাণ হল বারাসত মহকুমায় আমডাঙা অঞ্চলে অবস্থিত করুণাময়ী কালীমন্দির। কথিত যে এই মন্দির ও মূর্তি মানসিংহের নির্মিত। যদিও পরবর্তীকালে নদীয়াধিপতি কৃষ্ণচন্দ্র এর ব্যাপক সংস্কার সাধন করেন। মানসিংহের এই দেবী বিগ্রহ নির্মাণের মূলে ছিল শিলাদেবীর স্বপ্নাদেশ। তাঁর অনুরূপ প্রতিকৃতির বিগ্রহ তৈরি করে দিতে হবে সূক্ষ্মাবতী (সুঁটি নদী) নদী তীরে বনে জানান অবস্থানরত ভক্ত রামানন্দ গিরি গোস্বামীকে। কারণ রামনন্দ ছিলেন যশোরেশ্বরীর পূজারী। দেবীর অন্তর্ধানে তিনিও যশোর ত্যাগ করে সূক্ষ্মাবতী নদী তীরে বাস করতে থাকেন আর বেদনায় অশ্রুসিক্ত হতে থাকেন।

মানসিংহ দেবীর আদেশ পালন করেছিলেন অক্ষরে অক্ষরে। দেবী করুণাময়ী বিগ্রহ শিলাদেবীর হুবহু প্রতিরূপ। ইতিহাস সূত্র অনুসারে যশোরেশ্বরী তথা শিলাদেবীকে অম্বরে নিয়ে যাওয়ার কালে বাংলার কয়েকজন ব্রাহ্মণকে সাথে আনেন দেবীর পূজার্চনার জন্য। মানসিংহ বিশ্বাস করতেন এবং তাঁর বর্তমান বংশধররাও বিশ্বাস করেন বাংলার এই পুরোহিতরা দেবীকে জাগ্রত

(এরপর ১২ পাতায়)

সনাতনী শিক্ষা

মার্কণ্ডেয় পুরাণের বাণী

রবীন সেনগুপ্ত।। পৌরুষ প্রয়োগ না করে ভাগ্যের উপর অতিরিক্ত নির্ভর করে, খুব উদ্ধত স্বভাবের, চুরি করার প্রবণতা আছে, বেহিসেবী, ভীতু — এরকম মানুষের সাথে বেশি মিশবে না। নানা বিষয়ে খবর রাখে, নানা কাজে উৎসাহ আছে, সাহসী — এরকম মানুষের সাথে বেশি সম্পর্ক রাখবে। বেদজ্ঞানী বন্ধু পেলে তো কথাই নাই।

৩৪ অধ্যায়, শ্লোক ৮৭-৯১

মূল সংস্কৃত শ্লোক : গচ্ছেন্নৈত্রীয়ং ন চাশীর্লৈন চ চৌর্য্যাদিদূষিতৈঃ। ন চাতিব্যয়শীলৈশ্চ ন লুব্ধৈর্নাপি বৈরিভিঃ। ন বন্ধ কীর্ভিন ন্যূনৈবর্দ্ধকী পতিভিস্তথা। সার্দ্ধং ন বলিভিঃ কুর্য্যান্ন চ ন্যূনৈর্ননিন্দিতৈঃ। স সর্বব শঙ্কিভিনিত্যং ন চ দৈব পরৈর্ন রৈঃ। কুর্কীত সাধুভির্মৈত্রীং সদা চোরাবলম্বিভিঃ। প্রাজ্ঞৈরপিশুনৈঃ শক্তৈঃ কর্ম্মন্যুদ্ যোগভাগিভিঃ। বেদবিদ্যারতস্নাতৈঃ সহাসীত সদা বুষ।

তাৎপর্য বিশ্লেষণ : এখানে কার সাথে মিশব, কার সাথে মিশব না, এবিষয়ে খুবই স্পষ্ট নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু বর্তমান যুগে এই জাতীয় মিশবার উপযোগী ব্যক্তিত্ব খুবই কম আছে। যাদের সাথে মিশতে বারণ করা হয়েছে, তাদের মতো ব্যক্তির সংখ্যাই সমাজে অধিক। তবুও তারই মধ্যে মানুষের সাথে সম্পর্ক তৈরি করতেই হবে। ধরা যাক, কেউ খুব ভীতু, কিন্তু যে নানা বিষয়ে খবর রাখে। অথবা কেউ সাহসী কিন্তু বড্ড বেহিসেবী, এসব ক্ষেত্রে কি করা যাবে? এসব ক্ষেত্রে ব্যক্তিটির দোষ-গুণ উভয় দিক মাথায় রেখেই তার সাথে মাঝারি ধরনের সম্পর্ক গড়ে তুলতে হবে। খুব ঘনিষ্ঠতা করা যাবে না তাদের সাথে। তাদের গুণের দিকগুলি কাজে ব্যবহার করার চেষ্টা করতে হবে, দোষের দিকগুলি যতটা সম্ভব এড়িয়ে চলতে হবে।

পুজোয় কেমন থাকেন নতুন পোশাকের কারিগররা

ইন্দিরা রায়

প্রকৃতির নিয়মে এখন একের পর এক ঋতু ফিরে আসে না। প্রকৃতির খামখেয়ালিপনায় এখন কখনও গরম, কখনও বর্ষায় সাধারণ মানুষের জীবন অতিষ্ঠ। কিন্তু কালোমেঘের ফাঁকে সূর্যের উজ্জ্বলতা ঠিকই জানান দেয়, 'মা 'র আগমনবার্তা — শারদোৎসবের সূচনা। ফলে যতই প্রতিকূল পরিস্থিতি হোক না কেন, সব ক্ষেত্রেই পড়ে যায় 'সাজ সাজ' রব। যার যা পেশা হোক না কেন, পুজোর কাজে সবাই লেগে পড়ে।

রাস্তা দিয়ে চলতে গিয়ে দেখি দর্জির দোকান, কাপড়-জামার দোকান, জুতোর দোকানে ভিড় জমে উঠছে। কেনাকাটার বাজারে যতটা না ভিড়, নতুন জামা আধুনিক ডিজাইনে আকর্ষণীয় করে তুলতে টেলারিং শপে লাইন দিয়ে কাস্টমাররা দাঁড়িয়ে পড়ছেন। মাস্টাররা তাঁদের রকমারি অর্ডার নিতে হিমশিম খাচ্ছেন।

ঠিক তখনই তাঁদের সীমাহীন ব্যস্ততা দেখে মনে একটাই প্রশ্ন জাগে — যারা আজ কাস্টমারদের আধুনিক ডিজাইনের পোশাকে সাজিয়ে তুলছেন, তারা পুজোর দিনগুলিতে কি নিজেদের হাতে তৈরি নতুন পোশাকে নিজেদের সাজিয়ে তুলতে

পারেন, নাকি বছরের সেরা মুহূর্তগুলি কীভাবে যে কেটে যায় জানতে পারেন না। এই প্রসঙ্গে অভিমত জানার জন্য কয়েকটি মহিলা পরিচালিত বা মহিলা নিযুক্ত টেলারিং দোকানে যাওয়া হল।

উত্তর কলকাতার সুভাষ কর্ণারের 'দুই বোন', সেলাইয়ের দোকানে সকাল ১১ টা থেকে রাত্রি ৮ পর্যন্ত দেখা যায় দুই বোনকে — নমিতা ও দর্পণা ধরকে, যারা আজ ছ'বছর ধরে এখানে মহিলাদের বিভিন্ন ধরনের জামা-ব্লাউজ, সালোয়ার কামিজ তৈরি করেন। তার সঙ্গে শাড়িতে ফলস, পিকো, অলটার করার কাজ করে থাকেন। তাদের কাছে প্রশ্ন রাখা হয়, কাস্টমারদের অর্ডার তো মনের মতো সাঙ্গ করেন। কিন্তু নিজেদের জন্য কিছু কাজ করতে পারেন? সেলাই মেশিন চালাতে চালাতেই বললেন, (মৃদু হেসে নমিতা ধর) হ্যাঁ, আমরা পুজোয় আর পাঁচজনের মতোই আনন্দ করতে পারি। কারণ, আমরা জানি পুজোর চাপ ষষ্ঠীর দিন পর্যন্ত থাকে। এরপর আর নিজেদের জন্য কিছু করা যাবে না। তাই, পুজোর অর্ডার আসার অনেক আগেই আমরা দুটো করে সালোয়ার কামিজ রেডি করে রাখি। ফলে কোনও

অসুবিধা হয় না। এছাড়া, শাড়ি, সাজের জিনিস কেনার জন্য রবিবার দেখে দোকানে যাই। সাধারণত দোকানের এই চাপ চলে জগদ্ধাত্রী পুজো পর্যন্ত। তারপর কিছুটা হালকা হতে পারি। দু'জনে তো সব কাজ করে ওঠা সম্ভব নয়, তাই দশজন লোক আছে, যাদের সঙ্গে কনট্রাক্টে কাজ চলে।

শ্রীমানী মার্কেট ছাড়িয়ে বিধান সরণির ওপর চোখে পড়বে 'ম্যাডাম' দোকান। নামটা শুনেই বোঝা যায়, মহিলাদের এবং মহিলাদের জন্যই দীর্ঘ বছরের এই দোকান। দোকানের কাজকর্ম ও চেহারা আর পাঁচটা দোকানের মতো নয়। এই দোকানের বৈশিষ্ট্য হল, এখানে প্রবেশ করে কোনও তৈরি জামা টাঙানো দেখা যায় না। মহিলারা থাকেন, তারাই কাস্টমারদের অর্ডার নিয়ে নেন। একধারে দোকানের কর্ণধার জয়শ্রী গোস্বামী, তাঁর সঙ্গে কথা বলে জানা গেল, তাদের মহিলা কর্মীরা আর পাঁচজনের মতোই নিজের তৈরি নতুন জামা পরে আনন্দ করতেই পারে। সর্ব প্রথম এই দোকান ছিল 'রাজলক্ষ্মী' নামে বিবেকানন্দ রোডের ওপর। ৬০-এর দশকে দোকান পত্তনের সাত-আট বছর পরে 'ম্যাডাম' নামে শ্রীমানী মার্কেটের বিপরীতে স্থানান্তরিত হয়। এর কর্ণধার ছিলেন বীরেন রায়। ২০০২-এ ওনার মৃত্যু হয়। ওনার জীবিতকালেই একবার পুজোর সময়ে কর্মচারীরা স্ট্রাইক করে। তারপর দোকান বন্ধ হয়ে যায়, সাময়িকভাবে। তখন দোকান কিনে নিই। কর্মচারীদের সব রকম সুবিধা ও মানসিকভাবে খুশি রাখতে দোকানে একমাসের বোনাসের ব্যবস্থা আছে। একমাস আগে বোনাস দেওয়া হয় এবং প্রতি মহিলাকে দু'দিন ছুটি দেওয়া হয় পারিবারিক পূজা-বাজার করার জন্য। মাসিক বেতনও ভাল। ফলে, পুজোর সময়ে তাদের অসুবিধা হয় না। সপ্তমীতে বন্ধ হয়ে লক্ষ্মীপুজোর পর দোকান খোলে। এছাড়া, বছরে মে দিবস, ১৫ আগস্ট, দোল, ভাই ফোঁটায় বন্ধ থাকে।

লক্ষ্মীপুজো পর্যন্ত বন্ধ মানে যে পুজোর চাপ কম, তা নয়। এখন থেকেই কালীপুজোর অর্ডারের কাজ চলছে। তারপরই বিয়ের মরশুম। পুজোর অর্ডার নেওয়া ১ মাস আগে বন্ধ হয়। তাই, অসুবিধা হবে না। এই সঙ্গে জানিয়ে রাখি, 'ম্যাডাম'-এ ব্লাউজ, সালোয়ার কামিজ, মেয়েদের টপ, জিনসের স্কার্ট, জ্যাকেট, লেহঙ্গা তৈরি হয়। মজুরি খুবই সাধারণ। এখানকার ফিটিং-ই এই দোকানের বৈশিষ্ট্য। এটা সম্ভব একমাত্র মেজারমেন্ট এবং মাস্টারের সঙ্গে ভাল-কো-অপারেশনের জন্য— জানালেন জয়ন্তবাবু। এখানে ২৫ জন মহিলা কর্মী ছাড়াও, পুরুষকর্মীও আছেন। সল্ট লেকেও-এর একটি শাখা আছে।

উত্তর কলকাতার ২৯-এ রাজা রাজবল্লভ স্ট্রীট-এ 'রূপকথা' দোকানে চোখ রাখলেই দেখা যাবে দু'জন মহিলা সকাল-সন্ধ্যে দোকানে কাজ করে যাচ্ছেন। তিন বোন মিলে বাবার মৃত্যুর পর বাবার কেনা দোকানঘরে সামান্য মূলধনে কুড়ি বছর আগে টেলারিং-এর দোকান শুরু করেন। আজকে তারা স্বাবলম্বী এবং সহকর্মী রেখে সুনামের সঙ্গে এই কাজ করে চলেছেন। এত ব্যস্ততা যাদের, তারা পুজোর সময়ে কী করেন জানতে চাইলে, তপতী ঘোষ জানালেন, পুজোর অষ্টমীর দিন বেলা একটায় স্টাফেদের বেতন দিয়ে দোকান বন্ধ হয়। বুঝে দেখুন, তখন শরীরের অবস্থা। অবসন্ন, ক্লান্ত। ফলেই, বাড়িতে শুয়ে দিন কাটাই। বন্ধ তো মাত্র দু'দিন। শারদোৎসব বলতে কালীপুজো পর্যন্ত। তারপরই বিয়ের অর্ডার নেওয়া শুরু হয়। ফলে, একাদশী থেকেই আবার কাজের চাপ থাকে। বারোমাস ভালই অর্ডার থাকে। পুজোর সময়ে দেড়মাস আগে থেকে ওভারটাইম চলে। ১৫ আগস্টের পর থেকে চাপ আসে। এখানে সালোয়ার-কামিজ, ব্লাউজ, টপর ঘাগরা, টপ স্কার্ট তৈরি হয়। তা ছাড়া ফলস, পিকো বসানো হয়। সুতরাং দুর্গাপুজোর বিশেষ আনন্দ বলে আমাদের কিছু নেই।

।। চিত্রকথা ।। হনুমান ও ভীম ।। ৩

অম্বর দুর্গের শীলাদেবী

(১১ পাতার পর)

রাখতে সক্ষম। তাই দেবীর পূজায় নিযুক্ত আজও বাংলার পুরোহিতকুল।

রাজস্থানের বর্তমান রাজধানী জয়পুর থেকে অম্বরের দূরত্ব প্রায় ১১ কিলোমিটার উত্তরে। অম্বর ছিল রাজপুতানার কাছওয়া রাজপুতদের ধাত্রীভূমি। প্রাচীন নাম অম্বিকাপুর বা অম্বাবতী। অম্বর দুর্গে দেখার মতো আছে বহু জায়গা। সবচেয়ে আকর্ষণীয় হল শিলাদেবীর মন্দির। শারদ নবরাত্রি ও চৈত্র নবরাত্রির পূজায় দেবীর প্রধান উপাচার হিসেবে নিবেদন করা হয় কারণবারি বা মদ। মদের বোতলের অর্ধেক পুরোহিতরা নিবেদন করেন দেবীকে। বাকিটা প্রসাদ হিসেবে ফিরিয়ে দেন ভক্তদের। মন্দিরে পশুবলি আগে হলেও, এখন তা অজানা কারণে বন্ধ। দূর্গা ও বাসন্তী নবরাত্রির সময় অম্বর দুর্গে দেবী দর্শনে বিশাল জনসমাগম ঘটে। ভক্তেরা ঘন্টার পর ঘন্টা দাঁড়িয়ে থাকেন সারিবদ্ধ ভাবে। বিশ্বাস, নবরাত্রিতে দেবী জাগ্রতা হন এবং ভক্তদের মনস্কামনা পূর্ণ করেন।

হিলারির ভারত সফরে আমেরিকান দাদাগিরি বহাল

ভারতীয় স্বাভিমান চ্যালেঞ্জের মুখে

মুজফ্‌ফর হোসেন

সম্প্রতি মিশরের শার্ম আল শেখ-এ ভারতের প্রধানমন্ত্রী মনমোহনকে পাক প্রধানমন্ত্রী ইউসুফ গিলানি বালুচিস্তানে অভ্যন্তরীণ গণ্ডগোলের জন্য দায়ী করেন। ভারতের ক্ষমতাবান প্রধানমন্ত্রী সেই অভিযোগের স্বীকৃতি দেন স্বাক্ষর প্রদান করে। এদিকে ওই সময়ে ভারতে পাঁচদিনের সফরে আসেন আমেরিকান বিদেশমন্ত্রী হিলারি ক্লিন্টন। তিনি এসে মুম্বাই পৌঁছেই মুম্বাইয়ে (২৬/১১) হামলার সমালোচনা করে ভারতকে সান্ত্বনা দেওয়ার প্রয়াস করেন। যা প্রকৃতপক্ষে কেবলমাত্র লোক দেখানো। এসবই আমেরিকার সুচিন্তিত কূটনীতিরই এক অঙ্গমাত্র। ওটাই আমেরিকার কূটনৈতিক পরম্পরা। আর একটি দিক হল, যে কোনও আন্তর্জাতিক শীর্ষ সম্মেলনে যখনই কোনও ভারত-আমেরিকার দু'জন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিত্ব মুখোমুখি হয় তখন আমেরিকার পক্ষ থেকে যতদূর করা সম্ভব হয় ততটাই পাকিস্তানকে সমর্থন করা হয়। আমেরিকা পাকিস্তানকে যতই ধমক দিক, সমালোচনা করুক সবই প্রকৃতপক্ষে কথার কথা — শুধু মৌখিক প্রতিবাদমাত্র। ভারতীয় নেতারা ভারতে এই বিষয়ে কথা বলার সময় যতই সতর্ক থাকুন না কেন, দেশের বাইরে গেলেই তাদের তা খেয়াল থাকে না। কথাবার্তার ধরনই পাল্টে যায়। মুম্বাই হামলার পর প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং কঠোর অবস্থান নেওয়ার কথা বলেছিলেন। কিন্তু মিশরে গিয়ে তিনি পাকিস্তানকে 'সন্ত্রাসবাদী' বলা থেকে পিছু তো হঠলেনই, উল্টে পাকিস্তানকেও কথা দিয়ে দিলেন — যদি বালুচিস্তানে সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপে ভারতের জড়িত থাকার কোনও অভিযোগ থাকে তাহলে ভারত তা অবশ্যই খতিয়ে দেখবে।

ভারতীয় প্রধানমন্ত্রীর এই কথায় পাক-প্রধানমন্ত্রী গিলানী হতোদ্যম হওয়ার বদলে বরং বেশ ভালো রকম উৎসাহিত হলেন বলা যায়। ভারত চাপ দিতে গিয়ে নিজেরাই চাপে পড়ে গেল। কংগ্রেস দলের পক্ষ থেকে প্রধানমন্ত্রীকে যত খুশি সমর্থন করুক না কেন পাকিস্তান কিন্তু ভারতের এই অবস্থাবিপাকে খুশীতে ডগমগ। এরপর হিলারি ক্লিন্টনও আর পিছিয়ে থাকবেন কেন! উনি আবারও পরমাণু সমঝোতার কথা তুলতে থাকলেন। দু'দেশের সই-সাবুদের পর যে সামান্য অবশিষ্ট থেকে গিয়েছিল সেটা পুরো করতেই তিনি ভারতে পৌঁছে গেলেন। সরকারের বিভিন্ন দপ্তরে কর্মরত সকলে ততক্ষণে বুঝতে শুরু করেছেন যে, পরমাণু সমঝোতার ওই শেষাংশটা কতটা ভয়াবহ।

ভারতকে তা নিয়ে হাজার বার ভাবনা চিন্তা করতে হবে। কিন্তু ততক্ষণে অনেক দেরি হয়ে গেছে, তীর হাতের বাইরে চলে গেছে। ফলটা দাঁড়াল হিলারি এক উপযাচকের রূপে ভারতে এসেছিলেন কিন্তু ফিরে গেলেন বিজয়িনীর বেশে। হিলারি কি চমৎকার করে গিয়েছেন তার ছবিটা ধীরে ধীরে পরিস্কার হচ্ছে। সেদিকে তাকালে বোঝাই যাচ্ছে যে, আমেরিকা যেটা চাইছিল তা ভারতকে দিয়ে স্বীকার করিয়ে নিয়েছে। এখন ভারতের কাছে পশ্চাত্তাপ বা আফ্‌সোস করা ছাড়া আর কিছু নেই।

বর্তমানে আমেরিকার সামনে সব থেকে বড় চ্যালেঞ্জ হল আর্থিক মন্দা থেকে পরিত্রাণ পাওয়া। এটা থেকে পার পাওয়া তখনই সম্ভব যখন আমেরিকার তৈরি জিনিসপত্র অন্য কোনও দেশ কিনবে। কোনও দেশ থেকে যদি আমেরিকা আমদানী করে তাহলে আমেরিকার আমদানী বাড়ে। তখন সেই দেশকে ডলার বা যে মুদ্রায় চাইবে তা দিয়েই দাম মেটাতে হবে। এই বাস্তবিকতার জন্য আমেরিকা চাইছে — 'মেড ইন আমেরিকা' দ্রব্যাদি অন্য দেশ কিনে নিক। তাহলে একদিকে আমেরিকার আয় বাড়বে, বেকারত্বের পরিসংখ্যানটা হ্রাস পাবে। হিলারির ভারত সফরের একটা উদ্দেশ্য এটাও ছিল। তিনি ভারত আমেরিকা পরমাণু সমঝোতার পরও যেসব বাধা বাকী ছিল তা দূর করতেই ভারতে এসেছিলেন। ওই তথাকথিত অসামরিক পরমাণু সমঝোতা অনুসারে ভারত আগামী কুড়ি বছরের মধ্যে যে সকল ৪০ হাজার মেগাওয়াটের পরমাণু বিদ্যুৎকেন্দ্র তৈরি করবে তার যাবতীয় যন্ত্রপাতি, সাজ-সরঞ্জাম এবং প্রযুক্তি কেবলমাত্র আমেরিকার কাছ থেকেই কিনতে বাধ্য। আমেরিকার বড় বড় কোম্পানী এই কাজের অর্ডার নেবার জন্য ভারতে জাল বিছানো শুরু করে দিয়েছে।

সমঝোতার সময় এটা ঠিক ছিল না। তখন কথা ছিল ভারত প্রয়োজন মতো যন্ত্রপাতি যে কোনও দেশ থেকে কিনতে পারবে নিজের চাহিদা মতো। ভারত ভেবেছিল এক্ষেত্রে রাশিয়া থেকে আমদানি করলে সস্তা পড়বে। এবার হিলারি পরিস্কার করে দিয়েছেন, 'পরমাণু সন্ধি তখনই কার্যকরী হবে যখন ভারত পরমাণু বিদ্যুৎকেন্দ্রের জন্য প্রয়োজনীয় যাবতীয় কিছু আমেরিকার কাছ থেকেই খরিদ করবে।' আর সেই সব প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র কেনার জন্য খরচ পড়বে ১৭৫ আরব ডলার। আর তা বিক্রি করবে আমেরিকান কোম্পানী-জেনারেল ইলেকট্রিক এবং তোশিবা উইস্টিং-এর মতো বহুজাতিক কোম্পানি। ওই দুই কোম্পানীর হয়ে ওকালতি করতেই হিলারি ভারতে এসেছিলেন বললেও অত্যুক্তি হবে না। কিন্তু বস্তুতপক্ষে ভারতের উচিৎ এরকম আইন-কানুন তৈরি করা যার ফলে ওইসব কোম্পানীগুলো ভারতের হাতে বা নিয়ন্ত্রণে থাকে।

এখন দেখা দরকার — আমেরিকার এ ব্যাপারে অতিরিক্ত সতর্কতা কেন? ভারতীয় আইনকে কি আমেরিকা ভয় পায়? এই প্রসঙ্গ বা প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গেলে স্বাভাবিকভাবে ভূপাল-গ্যাস দুর্ঘটনার বিষয় উঠে আসে। পাঠকের নিশ্চয় স্মরণ আছে— ১৯৮৪ সালে ভূপালে আমেরিকান কোম্পানী 'ইউনিয়ন কার্বাইডের' কারখানায় বিষাক্ত গ্যাস লিক করেছিল। ওই ঘটনাকে বৈজ্ঞানিকরা শতাব্দীর সবচেয়ে বড় গ্যাস দুর্ঘটনা বলে অভিহিত করেছেন। পরিস্থিতি এতটাই ভয়ানক হয় যে, সেসময় কয়েক হাজার মানুষ মারা তো গেলেনই উপরন্তু যে প্রভাবিত মেয়েরা বেঁচে গিয়েছিলেন তারা এখনও বিকলাঙ্গ শিশুর জন্ম দিয়ে চলেছেন। অভিযোগ, মধ্যপ্রদেশের তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী কোম্পানীর সঙ্গে গোপন চুক্তি করে কোম্পানীর আমেরিকান ম্যানেজারকে ভারত থেকে পিছনের দরজা দিয়ে পালিয়ে যেতে সাহায্য করেছিলেন।

প্রশ্ন তো আমেরিকা থেকে মোটা টাকায় যন্ত্রপাতি কেনার বিষয়ে নয়। এক্ষেত্রে সে সব আইন বা ধারা আমেরিকার মাথাব্যথার কারণ তারও সংশোধন করার দরকার ছিল।

এবার হিলারির সফরের আরও অন্য একটি উল্লেখযোগ্য কারণ ছিল — যদি কোথাও ভূপাল গ্যাস দুর্ঘটনার মতো ঘটনা ঘটে তাহলে যেন আমেরিকাকে ক্ষতিপূরণ দিতে না হয়। সেক্ষেত্রে যে সকল ভারতীয় কোম্পানী সহযোগী হিসেবে কাজ করবে, তারাই ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য থাকবে। সোজা কথায় — পাপ করবে আমেরিকা আর শাস্তি ভোগ করবে ভারত। এখানে পাঠকদের আরও স্মরণ করিয়ে দেওয়া দরকার যে, ওইরকম বড় দুর্ঘটনা আর দু'টি ঘটেছিল। (১) রাশিয়ার চের্নোবিল পরমাণু কেন্দ্রের দুর্ঘটনা এবং (২) থ্রী-মাইল আইল্যান্ড দুর্ঘটনা। এই দুটি ভয়াবহ দুর্ঘটনার কথা পৃথিবীতে কেউ বিস্মৃত হবে না। কেননা দুটোই ছিল রাসায়নিক বিকীরণ -জনিত দুর্ঘটনা। ওই দুটি ঘটনায় পাঁচলক্ষ লোকের মৃত্যু ঘটেছিল। যার প্রভাব এখনও দেখতে পাওয়া যায়। চের্নোবিল দুর্ঘটনা থেকে রাশিয়া শিক্ষা নিয়েছে — তারা আর কখনও পরমাণু বিদ্যুৎকেন্দ্র তৈরি করবে না। এনরন কোম্পানী যখন মহারাষ্ট্রে বিদ্যুৎকেন্দ্র করতে যায় তখন ওই দৃষ্টিতেই ভারত জুড়ে বিরোধিতা হয়েছিল।

সারা পৃথিবীর সব দেশেই বিদ্যুতের চাহিদা এবং অভাব রয়েছে। যে সকল দেশ শীতপ্রধান সেখানে বিদ্যুতের চাহিদা বেশি। এজন্য পেট্রলের চাহিদাও সেখানে ক্রমাগত বেড়ে চলেছে। আমেরিকা পেট্রলের স্বার্থেই আরব দেশগুলোকে পরস্পর লড়িয়ে দেয়। এশিয়ার দেশগুলোতে তাপ-বিদ্যুৎ এবং জল-বিদ্যুতের প্রচলনই বেশি। ভারতে অতীতেও বার বার পরমাণু বিদ্যুৎ উৎপাদনের কথা উঠলেও অভিজ্ঞ প্রশাসকরা কখনও সবুজ পতাকা (অনুমতি) নাড়াননি।

ডঃ মনমোহন সিং-এর ২০০৪-এ প্রধানমন্ত্রী পদে আসাটা আমেরিকার পক্ষে হাতে চাঁদ পাওয়ার সমান হয়। সেজন্যই পরমাণু বিদ্যুৎকেন্দ্রের পরিকল্পনা স্বীকৃত হয়। দ্বিতীয়বার মনমোহনের প্রধানমন্ত্রীত্বে দিল্লীতে কংগ্রেস সরকার গড়লেও 'পরমাণু সমঝোতা চুক্তি'-ই সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ ছিল। বাস্তবে তা তো জনগণের সুরক্ষা এবং দেশের স্বাভিমানের প্রশ্ন। ভূপাল গ্যাস দুর্ঘটনার জন্য আমেরিকার ইউনিয়ন কার্বাইড কোম্পানীকে তিন আরব (১৫ হাজার কোটি) ডলার ক্ষতিপূরণ দিতে হোত। বাস্তবে মাত্র ৪৫ কোটি ডলার দিয়েই তারা নিস্তার পেয়ে গেছে বা হাত ধুয়ে ফেলেছে। এখন আমেরিকা চায় ভবিষ্যতে ওরকম দুর্ঘটনা ঘটলে আমেরিকান কোম্পানীকে যেন গুণাগার দিতে না হয়। হিলারি যে উদ্দেশ্যে ভারত সফরে এসেছিলেন তা সফল করে গেছেন।

আমরা হয়তো জানি না, অস্ট্রিয়ার মতো ছোট দেশও যখন আমেরিকার সঙ্গে একইরকম চুক্তি করেছে তারা কিন্তু দুর্ঘটনার ক্ষতিপূরণের এক এক পয়সা আমেরিকাকেই দিতে হবে বলে সই করিয়ে নিয়েছে।

প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক, ভারতের মনমোহন সিংহ সরকার আগবাড়িয়ে আমেরিকার সঙ্গে ওই পরমাণু চুক্তি করতে এত ব্যস্ত হয়ে উঠেছিল কেন? আমেরিকার দৃষ্টিতে ভারতীয়দের জীবনের যে কোনও দাম নেই তা ওই বহুচর্চিত পরমাণু চুক্তিতেই স্পষ্ট।

শার্ম আল শেখ-এ সফল পাকিস্তান আর ভারতে দৌত্যে সফল হিলারি ক্লিন্টন। ভারতের মতো মহান দেশের এ থেকে আফ্‌সোস করার আর কী থাকতে পারে!

"এবার হিলারির সফরের আরও অন্য একটি উল্লেখযোগ্য কারণ ছিল — যদি কোথাও ভূপাল গ্যাস দুর্ঘটনার মতো ঘটনা ঘটে তাহলে যেন আমেরিকাকে ক্ষতিপূরণ দিতে না হয়। সেক্ষেত্রে যে সকল ভারতীয় কোম্পানী সহযোগী হিসেবে কাজ করবে, তারাই ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য থাকবে।"

১৯৮৪ সালে ভূপালে 'ইউনিয়ন কাবাইড' থেকে নির্গত বিষাক্ত ধোঁয়ায় মৃত্যুমিছিল।

ঋদ্ধিমান-লক্ষ্মীরতন কবে সুযোগ পাবেন ?

নিজস্ব প্রতিনিধি ।। সি এ বি কর্তা ও মিডিয়ার কাছে আর কতদিন ব্রাত্য হয়ে থাকবে ঋদ্ধি মান সাহা, লক্ষ্মীরতন শুক্লা। চাম্পিয়নস ট্রফির তিরিশজনের দলেও আসেন না লক্ষ্মীরতন একথা বিশ্বাসযোগ্য ? আর ১৬ জনের স্কোয়াডে ঋদ্ধি মানের জায়গা হয় না কোন যুক্তিতে ? বাংলা থেকে মনোনীত জাতীয় নির্বাচক রাজা ভেঙ্কট কেন পদ আঁকড়ে বসে আছেন, মিডিয়াই বা কেন তাকে ছেড়ে দিচ্ছে। কয়েকদিন আগে সম্বরণ ব্যানার্জি একটি টিভি চ্যানেলের সঙ্গে কথা প্রসঙ্গে বলেছিলেন, তিনি জাতীয় নির্বাচক থাকলে বাংলার দুই কৃতি ক্রিকেটার এভাবে বঞ্চি ত হতেন না। তার কথা বিশ্বাসযোগ্য, কারণ তার নির্বাচক পদে থাকাকালীন ই সৌরভ জাতীয় দলভুক্ত হন। উৎপল চ্যাটার্জি ও লক্ষ্মীরতন স্কোয়াডে ঢুকে পড়েছিলেন। লক্ষ্মীর অবশ্য মূল দলে ঢোকা সম্ভব হয়নি। তবে ১৯৯৯-র লক্ষ্মী আর আজকের লক্ষ্মীর মধ্যে অনেক তফাৎ। দশ বছরে অনেক পরিণত ও পরিশীলিত হয়েছেন তিনি। এখন দেশের অন্যতম সেরা অলরাউন্ডার তিনি। গত তিন-চার বছরে বাংলার ক্রিকেট সর্বভারতীয় প্রেক্ষিতে যে জায়গায় গেছে, তার পিছনে লক্ষ্মীরতনের ভুমিকা অনস্বীকার্য বহু গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে ব্যাট কিংবা বল হাতে বাংলাকে উতরে দিয়েছেন।

ঋদ্ধি মান

লক্ষ্মীরতন

'ক্রাইসিস ম্যান' লক্ষ্মীরতন আই পি এলে নাইট রাইডার্সকেও টেনে তুলেছেন খাদের কিনারা থেকে। ২০০৫-০৬, ২০০৬-০৭ পরপর দু'বছর রণজি ট্রফি ফাইনালিস্ট বাংলার সেরা খেলোয়াড় ছিলেন লক্ষ্মীরতন।

ঋদ্ধি মান এই মুহূর্তে দেশের দু'নম্বর কিপার। ব্যাটের হাতটিও বেশ ভাল। দীপ দাশগুপ্তের জায়গায় বাংলার উইকেট কিপারের গুরুদায়িত্ব চমৎকারভাবে পালন করে গেছেন দুই মরসুম। বড় ম্যাচে ব্যাট হাতেও জ্বলে উঠেছেন। এখনি হয়তো ধোনির জায়গায় তার নাম বিবেচিত হবার সম্ভাবনা নেই, কিন্তু দু'নম্বর কিপার হিসেবে কেন দীনেশ কার্তিক ? সুনীল গাভাসকার তার নিজের কলামে ঋদ্ধি মানের হয়ে জোরালো সওয়াল করেছেন। তবে আজ হোক কিংবা কাল ঋদ্ধি মান জাতীয় দলে চলে আসবেনই। তার বয়স কম, গাভাসকারের প্রশংসা ধন্য, অতএব নির্বাচকরা নিতে বাধ্য হবেন।

কিন্তু লক্ষ্মীর হয়ে গলা ফাটাবে কে ? বয়স হয়ে গেছে, যদিও ৩০ বছরে অনেক ক্রিকেটারই আন্তর্জাতিক ক্রিকেট জীবন শুরু করে থাকে। গত ৫/৬ মরসুম যে ধারাবাহিকতা দেখিয়েছেন লক্ষ্মী ঘরোয়া সব পর্যায়ের ক্রিকেটে, তারপরেও তাকে জাতীয় দলের বাইরে রাখাটা ঘোরতর অন্যায়। তার নাইট রাইডার্স সহযোগী রিকি পন্টিং, ব্রেন্ডন ম্যাকুলামরা রীতিমতো বিস্মিত লক্ষ্মীকে জাতীয় দলের বাইরে দেখে। তার অবস্থা দাঁড়িয়েছে অনেকটা উৎপল চ্যাটার্জির মতো।

বাংলার সর্বকালের অন্যতম সেরা ক্রিকেটার উৎপল মাত্র তিনটি একদিনের ম্যাচ খেলেছেন। অথচ তার চেয়ে অনেক কম যোগ্যতাসম্পন্ন স্পিনার দেশের হয়ে একগাদা টেস্ট, একদিনের ম্যাচ খেলেছেন। উৎপলের জন্য লড়েননি তৎকালীন অধিনায়ক সৌরভও। যদিও উৎপলের তখন পড়তি ফর্ম কিন্তু বুড়ো বয়সে অন্তত ১০-১২টি টেস্ট তো খেলানো যেত। সিএবি ও মিডিয়া যতটা সৌরভের জন্য লড়েছে, তাকে নিয়ে ভাবনা-চিন্তা করেছে বা করে, এখনও তার সিকিভাগও করেনি উৎপল, লক্ষ্মী, ঋদ্ধি মান, মনোজ তেওয়ারি, রণদেব বসুদেব-এর জন্য। দেশের যে কোনও অঞ্চ লের যে কোনও মানের ক্রিকেটারদের চেয়ে এদের পারফরমেন্স কোন অংশে কম ? এরা কি শুধু রণজি, দলীপ ট্রফি খেলেই শেষ হয়ে যাবেন !

নতুন ক্রীড়ামন্ত্রীকে নিয়ে আশাবাদী ময়দান

নিজস্ব প্রতিনিধি ।। সদ্য প্রয়াত সুভাষ চক্রবর্তীর স্থলাভিষিক্ত হয়ে কান্তি গঙ্গোপাধ্যায় প্রথম সাক্ষাৎকারে যেসব কথা বলেছেন তাতে বাংলার ক্রীড়া সংস্কৃতি আবার তার নিজস্ব অস্তিত্ব ফিরে পাবে, এমনটাই মনে করছে ময়দানী ক্রীড়াসমাজ। টানা তিন দশক রাজ্যের ক্রীড়া মন্ত্রক পরিচালনা করে ক্রীড়া সংস্কৃতিটাই ভুলিয়ে দিয়েছিলেন সুভাষ চক্রবর্তী। জাতীয় গেমসের দিকে তাকালেই এই অভিযোগটি অনুধাবন করা যায়। যে বাংলা আগে অধিকাংশ খেলাতেই দেশের মধ্যে অগ্রগণ্য ছিল, আজ দূরবীণ দিয়ে খুঁজতে হয় সেইসব খেলায় বাংলার অবস্থানকে।

সল্ট লেক স্টেডিয়াম তৈরি হবার সময় বাঙালী গর্বে ফুলে উঠেছিল। বিশ্ব মানের একটা স্টেডিয়াম এরাজ্যে হচ্ছে, কত আন্তর্জাতিক ম্যাচ হবে, বিশ্ব মানের অ্যাথলিটরা দৌড়বে ট্র্যাকে, কত না স্বপ্ন, আশা-আকাঙ্ক্ষা। অথচ সেই স্টেডিয়ামের দিকে আজ তাকানো যায় না। ভেতরে বাইরে চূড়ান্ত অব্যবস্থা, অপরিচ্ছন্ন বাতাবরণ। অথচ দিল্লীর নেহরু স্টেডিয়াম কমপ্লেক্সে যান, চোখ জুড়িয়ে যাবে। চেন্নাই, গোয়া, কেরল সর্বত্র যথাযথ রক্ষণা-বেক্ষণ হয় স্টেডিয়ামের, মাঠের। তাই আন্তর্জাতিক ফুটবল ম্যাচ ওইসব রাজ্যের স্টেডিয়ামে হয়। আর এখানে ফিফা কোনও ম্যাচ দেয় না, ম্যাচ চলাকালীন আলো নিভে যায় বলে। মাঠের অবস্থা আরও খারাপ, পরের পর জলসার কারণে। নতুন ক্রীড়ামন্ত্রী তার হাতে গড়া যাদবপুরের কিশোর ভারতী স্টেডিয়াম সীমাবদ্ধ তার মধ্যেও রক্ষণাবেক্ষণ করে যাচ্ছেন। সেখানে নিয়মিত কচি-কাঁচাদের ফুটবল প্রশিক্ষণ শিবির চলে। মাঠ নিয়েও মোটামুটি সন্তুষ্ট কোচিং ক্যাম্পের প্রশিক্ষকরা। মাঝে মধ্যে বড়দের বড় মাপের খেলাও হয়। তিনি মাঠের রাজনীতিতে জড়াবেন না বলে দিয়েছেন। এই চিন্তাধারা অবশ্যই সাধুবাদযোগ্য। আদতে ইস্ট-বেঙ্গল সমর্থক হলেও ক্লাব রাজনীতি, সিএবি

কান্তি গাঙ্গুলী

—কোথাও থাকতে চান না। নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে গঠনমূলক কাজ করবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। ক্রীড়ামন্ত্রী হিসেবে তার প্রথম কাজ হবে রাজ্যের সর্বত্র ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা ক্রীড়া পর্ষদ পরিচালিত বিভিন্ন খেলার প্রশিক্ষণ শিবিরগুলোর প্রাণ ফিরিয়ে আনা। প্রতিটি সরকারি স্কুলে ক্রীড়া ও শরীরচর্চা বাধ্যতামূলক করা। রাজ্য অলিম্পিক সংস্থার সঙ্গে সমন্বয় রেখে সব খেলার সংস্কার ও উন্নতি সাধনে উপযুক্ত পরিকল্পনা নিয়ে কাজ করতে পারলে এই বাংলা এখনও সোনা ফলাতে পারে।

গোলরক্ষক সুব্রত পালের এই দুই বিশ্বস্ত হাতই ভারতকে এনে দিল নেহরু কাপ।

শব্দরূপ - ৫২০

দেবনীলা দাশগুপ্ত

■	১		২	■	৩	■	৪
■		■		■	৫		
৬	■	■	৭			■	
৮				■	■	■	
	■	■	■	৯			
	■	১০			■	■	
১১			■		■	১২	■
	■		■	১৩			■

সূত্র ঃ

পাশাপাশি ঃ ১. রাধিকার স্বামী, এর ভগিনী কুটিলা, ৫. রবীন্দ্র উপন্যাস, প্রথম দু'য়ে পণ্য সামগ্রী, ৭. লঙ্কাধিপতি দশানন, ৮. একই শব্দে ডালিম বিশেষ, পৌরাণিক অসুর বিশেষ যার প্রতিটি রক্তের ফোটা থেকে নতুন অসুরের জন্ম হতো, ৯. সুপরিচিত লাল রঙের গন্ধহীন পুষ্প বিশেষ, কালী মায়ের প্রিয় ফুল, ১০. প্রদীপাদি দিয়ে দেবমূর্তি বরণ, নীরাঞ্জনা, ১১. তৎসম শব্দে শৃঙ্খল, নিগড়, ১২. দেহের নানা স্থানে চন্দন প্রভৃতির ফোঁটা বা ছাপ।

উপর-নীচ ঃ ১. চন্দ্রবংশের রাজা, মাতা উর্বশী, অন্য শব্দে জীবনকাল, ২. নৃত্যকলার উদ্ভাবক বলে মহাদেবের এই নাম, ৩. সত্যাসত্য বিচারের নিদর্শন বা উপায়, যথাযথ জ্ঞান, ৪. এই তীর দিয়ে অর্জুন ভীষ্মের মস্তকে উপাধান প্রদান করেন, একে-তিনে ভ্রমর,তিনে-চারে উকুনের ডিম, ৬. এই দৈত্যরাজ প্রহ্লাদের পিতা, ৯. মদন, কন্দর্প, শেষ দুয়ে স্বামী, ১০. লাক্ষার রস, ১২. এই রাক্ষসকে ভীম নিহত করেন, সাদা রঙের ফুল বিশেষ।

সমাধান শব্দরূপ ৫১৮

সঠিক উত্তরদাতা

ডাঃ শান্তনু গুড়িয়া
বাগনান, হাওড়া।
শৌনক রায়চৌধুরী
কলকাতা-৯।

শব্দরূপের উত্তর পাঠান আমাদের ঠিকানায়। খামের ওপর লিখুন 'শব্দরূপ'।

■	■	■	কি	■	মু	ন	শি
■	গ	ণে	শ	■	দ্র	■	ব
চৈ	■	■	ল	ব	ণ	■	না
ত	মো	ম	য়	■	■	■	থ
ন্য	■	■	■	শা	হে	ন	শা
ম	■	মা	ণি	ক	■	■	স্ত্রী
ঙ্গ	■	র্ডা	■	ভা	র	ত	■
ল	হ	র	■	ত	■	■	■

● এই সংখ্যার সমাধান আগামী ১৪ সেপ্টেম্বর ২০০৯ সংখ্যায়।

ভারতীয় হকির হকিৎ ফিরবে কবে ?

জয়দীপ বন্দ্যোপাধ্যায় ।। কে পি এস গিলের জমানা শেষ করে দিয়েও ভারতবর্ষের হকির 'রাহুর দশা' কাটছে না। সদ্য ইউরোপ সফর করে আসা জাতীয় হকি দলকে নিয়ে আশাব্যঞ্জক কোনও স্বপ্ন না দেখাই সমীচিন। গিলের আমলে দল নির্বাচনে স্বজনপোষণ করা হ'ত, স্বচ্ছতা থাকতো না। তাই তখন ব্যর্থতার একটা কারণ ছিল। নবগঠিত হকি ফেডারেশন অফ্ইন্ডিয়া মোটামুটি দেশের সেরা খেলোয়াড়দের নিয়ে দল গঠন করে ইউরোপের তিন দেশে প্রীতি ম্যাচ খেলতে পাঠিয়েছিল ভারতীয় দলকে। কিন্তু ফলাফলের কোনও হেরফের হয়নি।

প্রথমে ইংল্যান্ড সফরে গিয়ে প্রথম টেস্ট জেতে ভারত। পরের দুটি টেস্টে হেরে সিরিজ খোয়ায়, তারপর বেলজিয়াম সফরেও চিত্রনাট্যের কোনও পরিবর্তন হয়নি। দুর্বল বেলজিয়ামের বিরুদ্ধে প্রথম ম্যাচ জিতলেও পরের ম্যাচ দুটি ড্র রাখতে বাধ্য হয় ভারত। শেষে হল্যান্ড সফরে গিয়ে পায়ের নীচে জমি খুঁজে পায়নি দল। বিশ্বের এক নম্বর দল হল্যাণ্ড যে সিরিজ জিতবে তা প্রত্যাশিতই ছিল। কিন্তু ন্যূনতম প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারবে না ভারত— এব্যাপারটা একেবারেই মাথায় ছিল না হকি-প্রেমীদের।

কেন এই অবস্থা, কিছুতেই অন্ধকার সংকট পথ শেষ হচ্ছে না। এত স্পনসরশিপ, বিদেশ সফর কিন্তু সাফল্য ধরা দিচ্ছে না। কয়েকমাস আগে মালয়েশিয়ায় সুলতান আজলান শাহ টুর্ণামেন্ট জেতায় মনে হয়েছিল এবার বুঝি সুদিন আসছে। যদিও ওই টুর্ণামেন্টে পাকিস্তান আর নিউজিল্যান্ড ছাড়া বড় দল বলতে তেমন কেউ ছিল না। কিন্তু গত কয়েক বছরে হারতে হারতে এমন অবস্থা হয়েছে ভারতীয় হকির যে পাকিস্তান, নিউজিল্যান্ড কিংবা মালয়েশিয়াকে হারিয়ে কোনও টুর্ণামেন্ট জেতাকেও গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করতে হচ্ছে। তাই আজলান শাহ জেতা থেকে ভারতীয় হকির ঘুরে দাঁড়ানো শুরু বলে মনে হয়েছিল।

তারপর কি দেখা গেল — এশিয়া কাপের খেতাব ধরে রাখতে ব্যর্থ ভারত। ইউরোপ সফরেও দাগ কাটার মতো পারফরমেন্সের নামগন্ধ নেই। স্পনসর সাহারা গোষ্ঠী যদি মুখ ফিরিয়ে নেয়, তাহলে কিছু বলার থাকবে না। আন্তর্জাতিক হকি ফেডারেশন নানাভাবে সাহায্য করছে ভারতীয় হকির পুনরুত্থান ঘটাতে। সব সাহার্যই মনে হচ্ছে ভস্মে ঘি ঢালার মতো। ২০১০-এ বিশ্বকাপ হকির আসর বসছে দিল্লীতে। তারপর আছে কমনওয়েলথ গেমস ও এশিয়ান গেমস্। পরপর বড় পরীক্ষা, কিন্তু সাম্প্রতিক ফলের নিরীখে কোনও দিক চক্রবাল দেখা যাচ্ছে না।

ন্যাশানালিস্ট ল'ইয়ারস ফোরামের নব নির্বাচিত কমিটি

গত ২২ আগস্ট ন্যাশনালিস্ট ল'ইয়ারস ফোরামের নবনির্বাচিত কমিটি গঠিত হল। এর আগে ২৫ জুলাই বার্ষিক সভায় ২০০৯-১১-র নতুন কমিটির জন্য প্রতিনিধিদের নির্বাচন করা হয়। দক্ষিণেশ্বরের দেশপ্রিয় ইনস্টিটিউটে অনুষ্ঠিত এই সভায় উত্তরবঙ্গ ও দক্ষিণবঙ্গ থেকে আইনজীবীরা অংশগ্রহণ করেন। সভার সভাপতি ছিলেন ব্যারিস্টার অমরেশ চন্দ্র চক্রবর্তী। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সুপ্রীম কোর্টের আইনজীবী তথা অখিল ভারতীয় অধিবক্তা পরিষদের সভাপতি ভূপেন্দ্র যাদব।

সভায় বিশিষ্টজনদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের প্রাক্তন পূর্বক্ষেত্র সঙ্ঘচালক তথা বিশিষ্ট আইনজীবী কালিদাস বসু। গত ২২ আগস্ট নবনির্বাচিত প্রতিনিধিদের নিয়ে কমিটি গঠন করা হয়। সভাপতি হিসাবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন অমিয় রায়। সহ-সভাপতি কিঞ্জল বড়াল ও অজয় কুমার নন্দী।

সাধারণ সম্পাদক — কমল ঘোষদস্তিদার। সংগঠন সম্পাদক — জয়দীপ রায়, কোষাধ্যক্ষ — মায়া বড়াল, কার্যালয় সম্পাদক — কমলাকান্ত মিশ্র, সম্পাদক — অমিত চক্রবর্তী, মতিলাল খাটুয়া, ধীরাজ ত্রিবেদী, নীলাঞ্জন সরকার।

চুরকা মুর্মুর বলিদান দিবস

গত ১৮ আগস্ট বীর চুরকা মুর্মুর বলিদান দিবস পালন করল রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ। দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার চকরামপ্রসাদ গ্রামের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাশের মাঠে এদিন এক স্মরণসভার আয়োজন করা হয়। বীর চুরকা মুর্মুর প্রতিকৃতি ও স্মৃতিসৌধে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানান সঙ্ঘের প্রবীণ প্রচারক কেশবরাও দীক্ষিত, উত্তরবঙ্গ প্রান্ত প্রচারক অদ্বৈত চরণ দত্ত, প্রান্ত সহ-কার্যবাহ প্রদীপ অধিকারী সহ সঙ্ঘের অন্যান্য কার্যকর্তা ও স্বয়ংসেবকরা। চকরামপ্রসাদ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক মঞ্জুকুমার বর্মনও শ্রদ্ধা জানান। গ্রামবাসীরাও বীর চরকার প্রতি শ্রদ্ধা অর্পণ করেন। উল্লেখ্য ১৯৭১-এর ১৮ আগস্ট পাকিস্তানী হানাদার বাহিনীর সঙ্গে ভারতীয় সীমান্ত রক্ষী বাহিনীর লড়াইয়ে ভারতের পক্ষে সেনাদের সাহায্য করতে এগিয়ে আসেন চরকা মুর্মু। চকরামপ্রসাদ গ্রামের শাখার তিনি মুখ্যশিক্ষক ছিলেন। নিজের প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে শত্রুপক্ষের গোলা বারুদ ভর্তি বাক্স জলে ফেলতে গেলে দুর্ভাগ্যক্রমে তিনি নিজেও শত্রুপক্ষের গুলিতে জলে পড়ে যান এবং শহীদ হন। সঙ্ঘ প্রতি বছরই তাঁর গ্রামে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা জানায়। এদিন স্মরণসভার পাশাপাশি তীরন্দাজি ও কবাডি প্রতিযোগিতারও আয়োজন করা হয়। দুই প্রতিযোগিতামূলক অনুষ্ঠানেই গ্রামবাসীরা যোগ দেন।

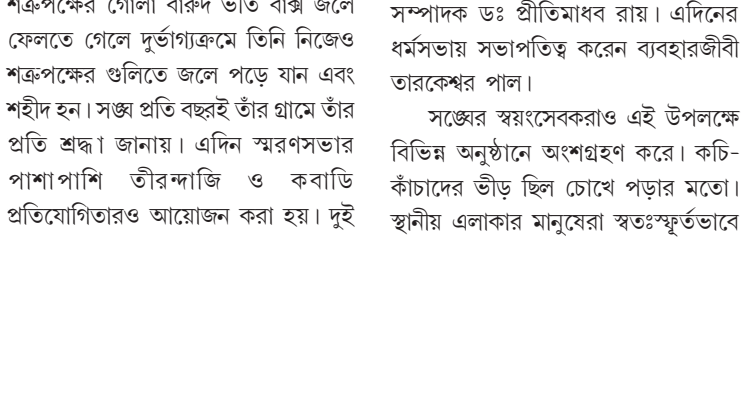

চুরকা মুর্মুর প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করছেন কেশবরাও দীক্ষিত। পাশে অদ্বৈত চরণ দত্ত।

এর পাশাপাশি এদিন হোম-যজ্ঞ, পূজা-পাঠ, গীতা পাঠ, ভজন, কৃষ্ণ সাজো-র প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। সারাদিন ধরে চলে বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠান। উৎসবে সমাজের বিভিন্ন স্তরের গুণীজনেরা উপস্থিত ছিলেন।

বিশিষ্টজনদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সঙ্ঘের ক্ষেত্র সঙ্ঘচালক রণেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, বিশিষ্ট চিন্তাবিদ্ তথাগত রায়, পরিষদের দক্ষিণবঙ্গের কোষাধ্যক্ষ প্রবীর দাশগুপ্ত এবং বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিতে ছিলেন পরিষদের প্রাক্তন রাজ্য সম্পাদক ডঃ প্রীতিমাধব রায়। এদিনের ধর্মসভায় সভাপতিত্ব করেন ব্যবহারজীবী তারকেশ্বর পাল।

সঙ্ঘের স্বয়ংসেবকরাও এই উপলক্ষে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে। কচি-কাঁচাদের ভীড় ছিল চোখে পড়ার মতো। স্থানীয় এলাকার মানুষেরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশ নেয়।

শোক সংবাদ

চলে গেলেন মৃণাল কান্তি বোস। গত ৪ আগস্ট তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৬ বছর। প্রয়াত মৃণাল কান্তি বোস বিশ্ব হিন্দু পরিষদের দক্ষিণ কলকাতার কোষাধ্যক্ষ ছিলেন। বিশ্ব হিন্দু পরিষদের দক্ষিণ কলকাতা শাখা তাঁর মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেছে। পরিষদ তাঁর শোক সন্তপ্ত পরিবারকে সমবেদনা জানায়। তিনি দুই পুত্র, দুই কন্যা রেখে গেছেন।

বাঁশদ্রোণীতে জন্মাষ্টমী

গত ১৩ আগস্ট, জন্মাষ্টমী তিথিতে দক্ষিণ কলকাতার বাঁশদ্রোণীতে জন্মাষ্টমী উৎসবের আয়োজন করে বিশ্ব হিন্দু পরিষদ। এই উপলক্ষে এক বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রার আয়োজন করা হয়। সেই সঙ্গে হরিনাম সঙ্কীর্তনের একটি দল এলাকার বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে।

জনজাগরণ মঞ্চে র অখণ্ড ভারত দিবস পালন

জনজাগরণ মঞ্চে র উদ্যোগে পালিত হল ঋষি অরবিন্দের জন্মদিন ও অখণ্ড ভারত দিবস। গত ১৫ আগস্ট দক্ষিণ কলকাতার নাকতলার কৈলাস বিদ্যাপীঠ ভবনে এক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে তা উদ্‌যাপন করা হয়। অনুষ্ঠানে সঙ্ঘের অতি দক্ষিণ ভাগের বৌদ্ধিক প্রমুখ শক্তিশেখর দাস ঋষি অরবিন্দর ওপর বক্তব্য রাখেন। অনুষ্ঠানে বিশিষ্টজনদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সঙ্ঘের দক্ষিণভাগের সঙ্ঘচালক অসীম কুমার গাঙ্গুলী; অতি দক্ষিণভাগ কার্যবাহ অচ্যুত কুমার গাঙ্গুলী। অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন বিশিষ্ট সমাজ- সেবী নরেশচন্দ্র গুহ। বন্দেমাতরম্ সঙ্গীত পরিবেশন করেন বিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

সংস্কার ভারতী আমতা শাখার 'কৃষ্ণসজ্জাপ্রদর্শন'।

উত্তর অসমে শৈক্ষিক মহাসংঘের যাত্রারম্ভ

উত্তর অসমে রাষ্ট্রীয় শৈক্ষিক মহাসঙ্ঘের প্রথম শাখা স্থাপিত হল। গৌহাটি, তেজপুর এবং ডিব্রুগড়ে তিনটি জেলায় এ্যাডহক কমিটি তৈরি হয়েছে। তেজপুরে মাধব ধামে গত ১৬ আগস্ট তেজপুর জেলার বিভিন্ন স্তরের শিক্ষকরা সম্মিলিত হন। সভায় আইন কলেজের প্রাক্তন সহ অধ্যক্ষ জীবন বেরা উপস্থিত ছিলেন। অধ্যাপক ডঃ স্বাধীনতা মহন্ত এবং অধ্যাপক ডঃ শৈলেন্দ্র বরঠাকুর জেলার যুগ্ম আহ্বায়ক নিযুক্ত হন। সভায় রাষ্ট্রীয় শৈক্ষিক মহাসঙ্ঘের সম্পাদক অজিত বিশ্বাস শৈক্ষিক মহাসঙ্ঘের আদর্শ ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন। ১৯৯৮ সালে মহাসঙ্ঘের ম্যাঙ্গালোরে প্রথম জাতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল। আগামী ২৪, ২৫, ২৬ অক্টোবর ২০০৯ জয়পুরে শৈক্ষিক মহাসঙ্ঘের ৪র্থ জাতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে। ১৭ আগস্ট কেশবধামে গৌহাটি জেলার শিক্ষকদের একটি সভায় সভাপতিত্ব করেন অধ্যাপক ডঃ বিভাস চন্দ্র দাস পুরকায়স্থ। গৌহাটি জেলার আহ্বায়ক নিযুক্ত হন প্রফুল্ল মহন্ত। উপস্থিত ছিলেন প্রধান শিক্ষক দুর্লভ গোস্বামী। গত ১৮ আগস্ট ডিব্রুগড়েও একটি শিক্ষক সভায় সভাপতিত্ব করেন ডিব্রুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শরৎচন্দ্র শর্মা। সভায় বক্তব্য রাখেন শিবু দত্ত, কমল শর্মা, বীণা বোরা প্রমুখ। সভায় ডিব্রুগড় জেলার আহ্বায়ক নিযুক্ত হন জ্যোতির্ময়ী দেবী এবং শিবু দত্ত। সভায় উপস্থিত ছিলেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের বিভাগ কার্যবাহ শান্তনু ভট্টাচার্য।

কৈলাশহরে জন্মাষ্টমী পালন

ত্রিপুরায় বিশ্ব হিন্দু পরিষদের কৈলাশহর প্রখন্ডের উদ্যোগে পালিত হল পুণ্য জন্মাষ্টমী তিথি। ১৩ আগস্ট জন্মাষ্টমীতে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব তিথিতে এদিন বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। তিন দিন ধরে ছিল ভিন্ন ভিন্ন অনুষ্ঠান। কৃষ্ণ পূজা, বেদ, গীতা পাঠ প্রভৃতির পাশাপাশি এদিন বিভিন্ন সাংস্কৃতিক, প্রতিযোগিতামূলক অনুষ্ঠানেরও আয়োজন হয়। কচিকাঁচারা কৃষ্ণ সাজো, আবৃত্তি, বসে আঁকো-র মতো ভিন্নধর্মী প্রতিযোগিতার অংশগ্রহণ করে। ১০৩ জন বাচ্চা বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় অংশ নেয়। এই উপলক্ষে আয়োজিত ধর্মসভায় সাধু-সন্তরা অংশ নেন। তাঁরা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ওপর প্রবচন রাখেন। শিলচরের ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের শ্রীমৎ স্বামী মৃন্ময়ানন্দ মহারাজ, কাঠিয়া বাবা মহারাজ, হরিদ্বারের বিশ্ব গায়ত্রী পরিবারের কৈলাশহর শাখার অধ্যক্ষ চন্দ্রকান্ত সিংহ প্রমুখ সাধুসন্তরা উপস্থিত ছিলেন। অন্যান্যদের মধ্যে ছিলেন বিশ্ব হিন্দু পরিষদের ত্রিপুরার রাজ্য সভাপতি আশুতোষ ধর, রাজ্য কার্যকরী সভাপতি প্রদীপ আচার্য প্রমুখ।

তারকেশ্বরে সঙ্ঘের কার্যালয়ের দারোদ্‌ঘাটন

গত ১৩ আগস্ট শুভ জন্মাষ্টমী তিথিতে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের তারকেশ্বর জেলার নিজস্ব নতুন কার্যালয়ের উদ্বোধন হল। এই উপলক্ষে পূজা ও সারা দিন ধরে বিভিন্ন কার্যক্রমের আয়োজন করা হয়েছিল। জেলার বিভিন্ন শাখা থেকে স্বয়ংসেবক ও তাদের পরিবারের লোকজন এই অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছিলেন। সকাল থেকেই নতুন কার্যালয় ভবনে পূজা শুরু হয় এবং স্বয়ংসেবক ও তাদের পরিবারের মানুষজন সমবেতভাবে জল নিয়ে বাবা তারকনাথের মন্দিরে পূজা দিতে যান। পরে ভারতমাতার প্রতিকৃতিতে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করে কার্যালয় ভবনের দারোদ্‌ঘাটন করেন সঙ্ঘের পূর্বক্ষেত্রের প্রচারক সুনীলপদ গোস্বামী। প্রায় পাঁচশো জন ওইদিন সহভোজে অংশ নিয়ে প্রসাদ গ্রহণ করেন। সঙ্ঘের এই কার্যালয় নির্মাণে

তারকেশ্বরে সঙ্ঘ কার্যালয়ের দ্বারোদ্‌ঘাটন উপলক্ষে সভা। বক্তব্য রাখছেন নবকুমার ধাড়া, ঠিক তাঁর বাঁ পাশে সুনীলপদ গোস্বামী।

সংবাদটি '১৯ জানুয়ারি কাটোয়া থেকে সংকীর্তন শুরু হয়ে' পড়তে হবে।

— সঃ স্বঃ

সমাবেশ সমাচার

নিজেদের অনুভব ব্যক্ত করেন জেলা সঙ্ঘচালক অধ্যাপক নবকুমার ধাড়া ও বিবেকানন্দ প্রামাণিক। জেলাতে প্রচারক হিসেবে কাজ করেছেন এবং জেলা থেকে অন্য জেলায় কাজ করতে গিয়েছেন এমন প্রচারক বন্ধুদেরও এদিন আমন্ত্রণ ও সংবর্ধনা জানানো হয়। প্রান্ত প্রচারক রমাপদ পাল, হুগলী জেলার প্রবীণ স্বয়ংসেবক পশুপতি ঘোষসহ দক্ষিণবঙ্গের প্রদেশ ও জেলাস্তরের প্রমুখ কার্যকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

জেলায় সঙ্ঘের কাজের ভিত্তি নির্মাণে ও প্রসারে কাজ করেছেন এমন প্রয়াত কার্যকর্তাদের স্মৃতিতর্পণ করে স্বস্তিকা-র সম্পাদক বিজয় আঢ্য বলেন, সঙ্ঘ কার্যালয় তথাকথিত কোনও অফিস নয়, সংস্কার কেন্দ্র — মন্দির। সুনীল পদ গোস্বামী পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে সঙ্ঘের কাজের প্রসারে স্বয়ংসেবকদের পথ নির্দেশ করেন।

মঙ্গলনিধি

সম্প্রতি নিজের দুই ভাইয়ের বিবাহ অনুষ্ঠান উপলক্ষে বালুরঘাটের স্বয়ংসেবক মৃণাল রায় তাঁর দুই ভাই-বউয়ের হাত দিয়ে এক হাজার টাকা করে মোট দুই হাজার টাকা 'মঙ্গল নিধি' প্রদান করেন। সঙ্ঘের দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা সেবা প্রমুখ অমিয় মাহাত এই অর্থ গ্রহণ করেন। উক্ত অনুষ্ঠানে জেলা কার্যবাহ সহ পরিবারের অন্যান্য সদস্য ও আত্মীয়-স্বজন উপস্থিত ছিলেন।

সংশোধনী

স্বস্তিকা-র গত ৩১ আগস্ট সংখ্যায় চতুর্থ পৃষ্ঠায় 'দেশ বিভগের জন্য জিন্না দায়ী' শীর্ষক

Swastika
7 September - 2009, Rs. 4.00 only
RNI No.5257/57
Registered No. SSRM/Kol. RMS/W.B./RNP - 048/2007-09
LICENSED TO POST WITHOUT PREPAYMENT
L.No. MM&P.O. - SSRM-Kol. RMS/ RNP-048/LPWP-021/2007-09

সেকালের কলকাতার দুর্গোৎসব

নিজস্ব প্রতিনিধি ।। জোব চার্নক তখনও পা রাখেননি গঙ্গাপারে। ক্লাইভেরও মুর্শিদাবাদের উপকণ্ঠে পৌঁছতে ঢের দেরী। কলকাতার অস্তিত্ব তখন মাত্র গোটা তিনেক গ্রামে। গ্রামগুলির নাম-- সুতানুটি, কলকাতা এবং গোবিন্দপুর। এই গোবিন্দপুরেরই দক্ষিণে বড়িষা বলে একটা জায়গায় থাকেন ওই তিন গ্রামের জমিদারমশাই সাবর্ণ চৌধুরী। সাত্ত্বিক, ভালো মানুষ জমিদারটির এক নাবালক বংশধরই আগামী দিনে জোব চার্নকের জামাই চালর্স আয়ারের হাতে তুলে দেবেন ওই তিন গ্রামের সত্ত্বভার। কলকাতাবাসী সাক্ষী হবেন বণিকের মানদন্ড রাজদন্ডে পরিণত হবার নকশীকাঁথায়। সেসব ঘটতে তো তখনও বহু দেরী। তারও আগে কলকাতাবাসী সাক্ষী হলেন আরেকটি অনন্য ঘটনার। ১৬২০ সালে তাঁর সাধের আটচালায় ধুমধাম করে দুর্গাপুজো করলেন সাবর্ণ চৌধুরীমশাই। কলকাতা মহানগরীর তখনও পত্তন হয়নি। কিন্তু সেই সময়ই দুর্গোৎসব ওতঃপ্রোতভাবে জড়িয়ে যায় বাঙালীর সঙ্গে। সাবর্ণ চৌধুরীর পরবর্তী সময়ে বাবু গোবিন্দরাম মিত্র এবং শোভাবাজারের রাজা নবকৃষ্ণ দেব দুর্গাপুজো আরম্ভ করেন। তবে এঁরা পুজো শুরু করেছিলেন ১৬৯৮ সাল নাগাদ কলকাতার পত্তন হওয়ার পর। নবকৃষ্ণ দেবের পুজো করার কারণটা আজকের দিনে যে কারুর বিস্ময় উদ্রেক করতে বাধ্য। শোভাবাজার রাজবাড়ির নাটমন্দিরে দুর্গাপুজো চালু করেছিলেন রাজা নবকৃষ্ণ দেব স্রেফ বৃটিশ সেনাপতি রবার্ট ক্লাইভ-কে খুশী করার জন্যে। কারণ ক্লাইভ ততদিনে সিরাজকে পরাস্ত করে একপ্রকার দখলই নিয়েছেন মুর্শিদাবাদের। বলা যায়, বণিকের মানদন্ড রাজদন্ডে পরিণত হবার সাক্ষী সেদিন কেবলমাত্র নবাব-গড়ের বাসিন্দারাই হননি, দুর্গোৎসবের মাধ্যমে তার করুণ পরিণতির সাক্ষী থেকেছিলেন তৎকালীন কলকাতার বাসিন্দারাও।

তবে কলকাতার পুজো ছিল বিপ্লবীদেরও পুজো। আনন্দমঠে বঙ্কিমচন্দ্রের মাতৃমূর্তির ত্রিরূপ দর্শন করে মা যা হইবেন' অর্থাৎ সালঙ্কারা, দশ-প্রহরণধারিণী দেবী দুর্গার পুজো করতে সেই সময় বিশেষ ব্যস্ত হয়ে উঠেছিলেন স্বাধীনতা সংগ্রামী বিপ্লবীরা। তাঁদের বদান্যতায় আঠেরো শতকের শেষেই কলকাতায় আগমন ঘটেছিল বারোয়ারী পুজোর। ১৭৯০ সালে 'সনাতন ধর্মোৎসাহিনী সভা' দুর্গাপুজোর আয়োজন করেছিল। তবে এর পরবর্তী সময়ে স্বদেশী আন্দোলন থেকে উৎসারিত 'মাতৃপুজো'র আরাধনা করে আজকালকার 'সার্বজনীন দুর্গোৎসবের' ভাবনায় রূপদান করেছিলেন সিমলা ব্যায়াম সমিতি'র পুজো-উদ্যোক্তারা। স্বামী বিবেকানন্দের মেজভাই মহেন্দ্রনাথ কলকাতার দুর্গাপুজো সম্বন্ধে বলছেন — 'কথায় ছিল, ঢাকে-ঢোলে অর্থাৎ দুর্গাপুজোয় এবং চড়কে লোকে দেনা চুকাইয়া দিত। তখন মুদির দোকান থেকে উট্‌নো নেওয়ার প্রথা ছিল। সেই বছরে দু'বার পরিশোধ হইত। সর্ববিষয়ে তখন দুর্গাপুজোয় মহা আনন্দের ভাব ছিল। এমন কি গ্রাম্য মুসলমানরা আসিয়া প্রতিমাকে তিনবার সেলাম, সেলাম বলিয়া চলিয়া যাইত। যাহাদের বাড়িতে প্রতিমা না আসিত, তাহারা কয়েকদিন চণ্ডীপাঠ করাইতেন। এটাই ছিল তখনকার দিনের জাতীয় উৎসব। হিন্দু মাত্রই তখন আনন্দে মাতিয়া উঠিত — এই হইল ভক্তিভাব ও জাতীয় ভাব।'

সাবর্ণ চৌধুরীর আটচালা

মহালয়ার আগেই প্রকাশিত হচ্ছে

পুজো মানেই ঠাকুর দেখা পুজো মানে হারিয়ে যাওয়া
পুজো মানেই খাওয়া-দাওয়া পুজো মানে চাওয়া-পাওয়া
পুজো মানেই একটু ছোঁয়া ওলট-পালট মুগ্ধ হওয়া

পুজো সংখ্যার অনবদ্য পুষ্পাঞ্জলি

উপন্যাস
সৌমিত্রশঙ্কর দাসগুপ্ত
সুমিত্রা ঘোষ
দীপঙ্কর দাস
বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায়

গল্প
রমানাথ রায়
শেখর বসু
এষা দে
গোপালকৃষ্ণ রায়
দীপক চন্দ্র,
জিষ্ণু বসু

ষষ্ঠীতে দেবী ভাবনা
সপ্তমীতে গল্প
অষ্টমীতে প্রবন্ধ
নবমীতে উপন্যাস
দশমীতে ছড়া
শেষ প্রহরে রম্যরচনা

ভ্রমণ ঃ সৌমেন নিয়োগী

প্রবন্ধ
প্রণব চট্টোপাধ্যায়
প্রণব রায়
দেবীপ্রসাদ রায়
তথাগত রায়
রাধেশ্যাম ব্রহ্মচারী
দীনেশচন্দ্র সিংহ
বলরাম চক্রবর্তী
নৃপেন্দ্র প্রসন্ন আচার্য
সুমিত চক্রবর্তী

সত্বর কপি বুক করুন ● দাম চল্লিশ টাকা মাত্র

রম্যরচনা ঃ চণ্ডী লাহিড়ী ● ছড়াকাহিনী ঃ শিবাশিস দণ্ড ● দেবী প্রসঙ্গ ঃ স্বামী অশোকানন্দ

Steelam
EXCLUSIVE FURNITURE
স্টীলম ত্রর ..... পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে
Exclusive Show Room দেওয়া হইবে॥
Factory :- 9732562101
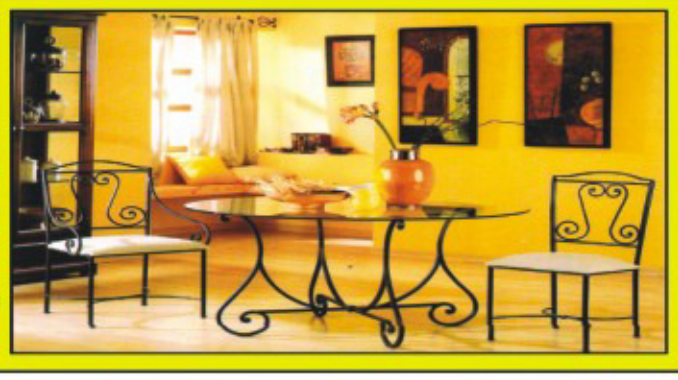

স্বস্তিক প্রকাশন ট্রাস্টের পক্ষে রণেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা - ৬ হতে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩ কৈলাস বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৬ হতে মুদ্রিত।
সম্পাদক ঃ বিজয় আঢ্য, দূরভাষ ঃ ২২৪১-০৬০৩, টেলিফ্যাক্স ঃ ২২৪১-৫৯১৫, e-mail : swastika5915@bsnl.in / vijoy.adya@gmail.com, website : www.eswastika.com